ব্যবস্থাপনা সংগঠন
Organizing in Management

ইউনিট ৭

একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের কর্মী পর্যন্ত প্রত্যেকের কাজ ও দায়িত্ব কি হবে, এদের ভেতরকার সম্পর্ক কি হবে, কতটুকু দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে, কার কি পদ বা পদমর্যাদা হবে তা সবকিছুই নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার একটি প্রণালীকে সংগঠন বলা যায়। তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী চিহ্নিতকরণ, কার্যাবলী শ্রেণীবদ্ধকরণ, উপকরণসমূহ একত্রীকরণ, শ্রেণীবদ্ধ প্রত্যেক কাজের বা বিভাগের জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃব্য নির্ধারণ ও প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : সংগঠনের সংজ্ঞা, সংগঠনের গুরুত্ব, ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নীতি বা আদর্শ

পাঠ-৭.২ : সংগঠনের প্রকারভেদ, অনানুষ্ঠানিক সংগঠন কিভাবে সৃষ্টি হয়?

পাঠ-৭.৩ : সরলরৈখিক সংগঠন, সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন

পাঠ-৭.৪ : কার্যভিত্তিক সংগঠন , কমিটি, ম্যাট্রিক্স সংগঠন

পাঠ-৭.৫ : বিভাগীকরণ , বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রকারভেদ কর্তৃত্বার্পণ বা ক্ষমতার্পন, কিভাবে ক্ষমতার্পন করা হয়

পাঠ-৭.৬ : তত্বাবধান পরিসর , কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় ও গ্রেকিউনাসের সূত্র

পাঠ-৭.৭ : কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কাকে বলে? কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ নির্ধারণের নীতি

পাঠ-৭.১ সংগঠনের সংজ্ঞা ও সংগঠনের গুরুত্ব, ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নীতি বা আদর্শ

Definition & Importance of Organization, Principles of Management Organization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠনের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংগঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংগঠনের সংজ্ঞা

Definition of Organization

সংগঠন হচ্ছে ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সৃষ্টি, তাদের কার্যাবলি সনাক্ত করে এগুলোর শ্রেণীবদ্ধকরণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয়সাধনকে সংগঠন বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের কর্মী পর্যন্ত প্রত্যেকের কাজ ও দায়িত্ব কি হবে, এদের ভেতরকার সম্পর্ক কতটুকু, দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে, কার কি পদ বা পদমর্যাদা হবে তা সবকিছুই নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সংগঠন হচ্ছে (১) প্রয়োজনীয় কাজ চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণীবিভাগ করা, (২) কাজকে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাগে ভাগ করা, (৩) প্রত্যেকটি ভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে তত্ত্বাবধান করার মত কর্তৃত্ব সহযোগে অর্পন করা ও (৪) সংগঠন কাঠামোর মধ্যে সমান্তরাল ও খাড়াখাড়ি ভাবে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা। Organizing শব্দটি "Organizm" থেকে এসেছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে কতগুলো পৃথক অংশকে এমনভাবে সমন্বিত করা যার কারণে প্রত্যেকটি অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে কোন কিছুর সৃষ্টি হয়।

সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার একটি প্রণালীকে সংগঠন বলা হয়। তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী চিহ্নিতকরণ, কার্যাবলী শ্রেণীবদ্ধকরণ উপকরণসমূহ একত্রীকরণ, শ্রেণীবদ্ধ প্রত্যেক কাজের বা বিভাগের জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃব্য নির্ধারণ ও প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলে।নিচে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের কিছু উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হলঃ

অইরিখ ও কুঞ্জ এর মতে, "সংগঠিতকরণ হলো উদ্দেশ্যার্জনের জন্য কার্যাবলিকে বিভাগীয়করণ, প্রত্যেক বিভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা, তাকে বিভাগীয় কাজ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সমান্তরাল ও খাড়াখাড়িভাবে সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা"(Organizing is the grouping of activities necessary to attain objectives, the assignment of each grouping to a manager with authority necessary to supervise it, and the provision for coordination horizontally and vertically in the enterprise structure)|

লুইস এ এ্যালেন এর মতে, " সম্পাদনযোগ্য কাজগুলো সনাক্তকরণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণ, কর্মীদের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বনির্ধারণ ও অর্পণ, এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীদের ফলপ্রসূভাবে কর্মসম্পাদনের নিমিত্তে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়াকে

সংগঠিতকরণ বা সংগঠন বলা হয়" (The process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives)|

টেরি ও ফ্রাংকলিন এর মতে (Terry and Franklin) "সংগঠন হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উত্তম আচরণগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে উক্ত ব্যক্তিবর্গ মিলে-মিশে সন্তুষ্টি সহকারে দক্ষতার সঙ্গে কতিপয় পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে পারে।"

উপরের আলোচনা থেকে বরা যায় যে, সংগঠন হল ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর মধ্যে এমন একটি কার্যপ্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী ও উপকরণাদি সনাক্তকরণ, এসব উপকরণ ও কাজকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করণ, উক্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের উপর দায়িত্ব, ক্ষমতাও ও কর্তৃত্ব অর্পন এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

সংগঠনের গুরুত্ব

Importance of Organization

সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কাজ ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সংগঠন কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে নতুন নতুন পন্থা পদ্ধতি, সূত্র, নিয়ম অথবা উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয় উন্নয়নে ও প্রয়োগে যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। নিচে ব্যবস্থাপনা সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হল ঃ

১. **উদ্দেশ্য অর্জনে সহযোগীতা (Co-operation to achieve objectives) ঃ** সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলীকে এদের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে প্রতি বিভাগের দায়িত্ব একজন কর্মকর্তা বা নির্বাহীর ওপর অর্পন করা হয়। শুধু বিভাগ নয়, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক স্তরে সৃষ্ট উপবিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্যও পৃথক করে দেয়া হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য অর্জন সহজতর হয়।

২. **বিশেষীকরণে সহায়তা (Aid to specialisation)ঃ** একটি প্রয়োগযোগ্য ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিশেষজ্ঞতা ও শ্রমবিভাগের নীতির ওপর গড়ে ওঠে। এর ফলে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। ফলে প্রত্যেক বিভাগ, উপবিভাগ এবং কর্মী তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সব সময়ই পালন করে থাকে। এ কারণে বিশেষজ্ঞতার গুণ প্রত্যেকেই অর্জন করতে পারে।

৩. **বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ (Removal of indiscipline) ঃ** সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কাজ ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ফলে কেউ কাজ বা দাযিত্ব এড়িয়ে চলতে পারে না। তাছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ, কর্মী, কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। এতে কাজের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা থাকে না।

৪. **মানব-শক্তির যথাযথ ব্যবহার (Effective utilisation of human resources) ঃ** আদর্শ সংগঠন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির কাম্য ও যথাযথ ব্যবহারের উপায় নির্দেশ করা থাকে। এর মাধ্যমে প্রতিটি কাজের ধরণ নির্ধারণ করে যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্য, তাকে সেই কাজের জন্য নিয়োগ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে কর্মীবাহিনীর সামর্থ পুরোপুরি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

৫. **সৃজনশীলতার বিকাশ (Development of creativity) ঃ** সংগঠন কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে নতুন নতুন পন্থা পদ্ধতি, সূত্র, নিয়ম অথবা উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয় উন্নয়নে ও প্রয়োগে যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমনঃ কর্মীগণ একই কাজ সব সময় করার ফলে ঐ কাজ যাতে আরও সহজভাবে কিভাবে করা যায় তা কর্মীরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা উদ্ভাবন করতে পারে। আর সংগঠনিক কাঠামোর দ্বারা তা সম্ভব হয়।

৬. **সহজ সমন্বয় (Easy co-ordination)** ঃ সংগঠনের একটি কাজ হল বিভিন্ন বিভাগ, কাজও কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি। এজন্য সংগঠনে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মী তার কার্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকে। এছাড়াও প্রত্যেকে তার উর্ধ্বতন ও অর্ধস্তন সম্পর্কে এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বিভাগ ও তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারে। এতে বিভিন্ন কর্মী ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

৭. **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বন্টন (Distribution of authority and responsibility)**ঃ সংগঠন সদস্যদের মধ্যে কর্তত্ব ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বন্টন করে কার্যের নির্দিষ্টতা নিশ্চিত করে ফলে সহেজই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

৮. **প্রশাসনিক কার্যে সহায়তা (Help in administrative task)**ঃ সুসংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী কাঠামো প্রশাসনের ভিতশক্ত করে। প্রশাসনিক দুর্বলতা ও বিচ্যুত অপসারিত হয় এবং কর্তৃত্ব সুষমভাবে বণ্টিত হয়। এর ফলে প্রশাসকগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশাসনকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করতে পারে।

৯. **সহজ নিয়ন্ত্রণ (Easy control)**ঃ সংগঠন কাঠামোতে প্রতিটি বিভাগ ও কর্মীর কার্য, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও দায়িত্বের স্পষ্ট ব্যাখ্যা থকায় তাদের কার্যাবলী সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া কে, কাকে, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তারও দিক নির্দেশনা সংগঠন কাঠামো হতেই পাওয়া যায়।

১০. **সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনে সহায়তা (Facilitate in expansion and alteration)**ঃ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুদূর পরাহত হয়। প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন সংগঠন কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এজন্য দূর দর্শিতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সংগঠন কাঠামো তৈরী করা হলে ভবিষ্যত সম্ভাব্য সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এই সংগঠন কাঠামোতে অত্যন্ত সহায়ক হয়।

১১. **ব্যবসায়ের উন্নয়ন (Development of business)** ঃ বর্তমান যুগে নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন এবং আধুনিক উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছে। এ সব নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন সাধন একমাত্র উত্তম সংগঠন কাঠামোর মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্যই শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠার ওপর বর্তমান কালে এত বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নীতি বা আদর্শ

Principles of Management Organization

নীতি (Principles) হলো পথ-নির্দেশিকা (guideline)| কোন কার্য সম্পাদনে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। তা হলে উক্ত কার্যাদি সুষ্টুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশেই পথ-নির্দেশনার উপর নির্ভর করে। এগুলিকে সংগঠনের নীতিমালা বলে। এ প্রসঙ্গে E.F.L. Brech বলেন, "পদ্ধতিগতভাবে সংগঠন কাঠামো গঠন করতে হলে সেখানে কতকগুলো গ্রহণযোগ্য নীতি থাকতে হবে, অর্থাৎ কতকগুলো স্বীকৃত মৌলিক উপাদান থাকতে হবে, যা প্রতিষ্ঠানের ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করবে। কার্যক্ষেত্রে এগুলির অনুপস্থিতি ব্যবস্থাপনার বিচ্যুতি নির্দেশ করে। (If there is to be a systematic approach to the formulation of organization structure, there ought to be a body of accepted principles, that is to say a set of agreed basic factors which will determine the effectiveness of an organization structure when at work in practice and the absence of which will, generally speaking, lead to deficiences in the working of management) নিচে সংগঠনের নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ঃ

১. উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Determining Objectives) ঃ সংগঠনের প্রথম নীতি হলো উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। কারণ উদ্দেশ্যের আলোকে ঠিক করা হয় যে, একটি সংগঠন কেমন হবে। উদাহরণস্বরূপ-একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও একটি সেবামূলক

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এক নয় এবং এদের সংগঠনের ধরনও ভিন্ন প্রকৃতির হবে। তাই ব্যবস্থাপনাকে সংগঠন কাঠামো নির্ধারণের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, উদ্দেশ্যের আলোকেই সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২. শ্রম বিভাজন (Division of Labour) ঃ সংগঠনে শ্রম বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় বহু ধরনের নির্বাহী ও কর্মীরা কর্মরত থাকেন। এদের মধ্যে যে যে ধরনের কাজে আগ্রহী ও দক্ষ, তাকে সে-ধরনের কাজেই নিয়োগ করতে হবে। এতে সকলেই সংশিøষ্ট কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অফধস ঝসরঃয বলেছেন যে, "কর্মী ও যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে শ্রম বিভাগের প্রয়োজন।" ঞবৎৎু ঋৎধহশষরহ বলেন, "বড় কাজকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তা বিভিন্ন লোকের মধ্যে বন্টন করাকে শ্রম বিভাজন বলে।"[৭](Division of labour means dividing large tasks in smaller packages of work to be distributed among several people)

৩. উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা (Good Communication System) ঃ সংগঠন কাঠামো ডিজাইন (design) করার সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা মনে রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বাইরে এবং অভ্যন্তরে অবাধ তথ্য প্রবাহের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি বিভাগের কাজের মধ্যে সুসমন্বয় গড়ে তুলতে হলে যোগাযোগের ধাপসমুহ কাম্য (optimun) পর্যায়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ যোগাযোগের ধাপ কম বা বেশী হলে চলবে না। যোগাযোগের ধাপ কম হলে তথ্য প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হবে, আবার বেশী হলে সঠিক তথ্য বিচ্যুতি আকারে কর্মীদের নিকট পৌছাঁতে পারে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

৪. কর্তৃত্বের গতিধারা (Scalar Chain) ঃ পদমর্যাদা অনুসারে পদগুলি সংগঠন কাঠামোতে সাজানোর নীতিকে কর্তৃত্বের গতিধারা নীতি বলে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তর থেকে নিচের স্তর পর্যন্ত সর্বত্র কর্তৃত্বের একটি প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে। এ প্রবাহে প্রতিটি বিভাগ, উপ-বিভাগ সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের নির্দেশনা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে আসে। সংশিøষ্ট সকলেই এ ধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে প্রচেষ্টা জোরদার হয় ও সন্তুষ্টিচিত্তে তাঁরা কার্য সম্পাদনে ব্রতী হয়। এ প্রসঙ্গে ঐবহৎর ঋধুড়ষ বলেন, "কর্তৃত্বের ধারা বা কতৃর্ত্বের শিকল প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি যোগাযোগের পন্থা নির্দেশ করে।"[৮](A scalar chain of authority extends from the top to the bottom of an organization and defines the communication path)

৫. কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর ও নিয়ন্ত্রণ (Optimum Span of Supervision and Control) ঃ একজন সুপারভাইজার একসাথে সর্বোচ্চ কতজন কর্মীর কাজ ভালভাবে দেখাশুনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সে পরিমাণকে কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর বলে। একটি সুষ্ঠু সংগঠন কাঠামো প্রণয়নের সময় কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তত্ত্বাবধান পরিধি বড় হলে একজন নির্বাহীর পক্ষে দক্ষতার সাথে তা পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হবে না। আবার, কাম্য পরিধির চেয়ে ছোট হলে সম্পদের অবচয় হবে। এতে দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। সুতরাং সংগঠন কাঠামো প্রনয়ণে নির্বাহীর যোগ্যতানুযায়ী তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ করতে হবে।

৬. দক্ষতার নীতি (Principle of Efficiency) ঃ যে প্রতিষ্ঠান যত দক্ষ, সে প্রতিষ্ঠান তত সফল। তাই সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নে দক্ষতা অর্জনের দিকে সুনজর দিতে হবে। Weihrich & Koontz বলেন, "সর্বনিু পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করাই হলো দক্ষতা।"[৯](Efficiency is the achievement of the ends with the least amount of resources) | সুতরাং সংগঠনকে সফল করতে হলে দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭. আদেশের ঐক্য (Unity of Command) ঃ আদেশের ঐক্য হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একই সাথে একজন কর্মী একজন নির্বাহীর নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ করবে। এ প্রসঙ্গে Henry Fayol বলেন, "একজন তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে একজন কর্মী আদেশ গ্রহণ করবে।"[১০](An employee should reecive orders from one supervisor)| কারণ একজন কর্মী একাধিক নির্বাহীর নিকট থেকে আদেশ পেলে তাঁর পক্ষে তা শৃংখলার সাথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই সংগঠন কাঠামোর সকল স্তরে যেন এ নীতি অনুসরণ করা হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৮. কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সামঞ্জস্য বিধান (Equality of Authority and Responsibility) ঃ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কোন কর্মীকে কাজের কর্তৃত্ব দেয়ার সাথে দায়িত্ব এবং দায়িত্ব দেয়ার সাথে কর্তৃত্বও দিতে হবে। কারণ দায়িত্ব ছাড়া কর্তৃত্ব দিলে কর্তৃত্ব গ্রহনকারী মনোযোগের সাথে দায়িত্ব পালন করবে না। আবার, শুধু দায়িত্ব দিলে কর্তৃত্ব না দিলে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। এতে তাঁদের মধ্যে হতাশা দেখা দিবে। তাই সংগঠন কাঠামোয় কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সামঞ্জস্য বিধান নীতিটি মনে রাখা প্রয়োজন।

৯. পদ বিশ্লেষণ ও ক্ষমতার্পন (Job Description and Deligation of Power)ঃ সংগঠন কাঠামো প্রণয়নের সময় বিভিন্ন পদ বিশেøষণ করে দেখতে হবে যে কোন্ পদের জন্য কি ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক প্রয়োজন, তাদের কাজের ধরণ কি হবে এবং সে মোতাবেক তাদেরকে কার্য সম্পাদনের ক্ষমতার্পন করতে হবে। ক্ষমতার্পন ব্যতীত শুধু কাজ করার দায়িত্ব দিলে হবে না। আবার, কাজ করার ক্ষমতার্পন করা হলে তা যেন পদের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে।

১০. সমন্বয় ও ভারসাম্য নীতি (Principle of Co-ordination and Balancing) ঃ সংগঠনে বিদ্যমান বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রশাখার কার্যক্রমের মধ্যে সুসমন্বয় ও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ কোন বিভাগের কাজ বেশী আবার কোন বিভাগের কাজ যেন কম না হয়। তাহলেই সংগঠনে শৃংখলা বজায় থাকবে।

১১. শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা (Order and Discipline) ঃ সংগঠনে এমন নিয়ম-নীতি ও শৃঙখলা সৃষ্টি ও প্রচলন করতে হবে যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যায় এবং অধস্তনরা উর্ধতনদের কথামত কাজ করে। কোন প্রকার অনিয়ম ও বিশৃংখলার স্থান যেন সংগঠনে না হয়।

১২. সহজ-সরল কাঠামো (Simple Structure) ঃ সংগঠন কাঠামো এমন হতে হবে যেন সকলের নিকট তা সহজেই বোধগম্য হয়। কাঠামোর মধ্যে উল্লেখিত কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মীরা সহজে বুঝতে না পারলে জটিলতা দেখা দিবে।

১৩. উপদেষ্টার ব্যবহার (Use of Staff) ঃ প্রতিষ্ঠানে দু'ধরনের কর্মকর্তা থাকতে পারে সরলরৈখিক কর্মকর্তা ও উপদেষ্টা কর্মকর্তা। উপদেষ্টাগণ প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা। তাঁরা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জটিল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এতে করে সরলরৈখিক কর্মকর্তাগণ অতি সহজেই কার্যসম্পাদন করতে পারেন। সুতরাং সংগঠন কাঠামোতে উপদেষ্টা ব্যবহারের সুযোগ রাখতে হবে।

১৪. নেতৃত্বের বিকাশ নীতি (Principle of Leadership) ঃ সংগঠন এমন হওয়া উচিত যাতে নিচের স্তরের নির্বাহীগণের উপরের স্তরে পদোন্নতি পেয়ে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ থাকে। একই পদে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করলে নির্বাহীদের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা আসে এবং তারা হতাশায় ভোগে। তাই নির্বাহীগণ যাতে উপরের দিকে উঠতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১৫. নমনীয়তার নীতি (Principle of Flexibility) ঃ নমনীয়তার অর্থ হলো পরিবর্তনশীলতা। সংগঠন কাঠামোতে পরিবর্তনের সুযোগ থাকতে হবে। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ বা সংকোচনের প্রয়োজন হতে পারে। কাঠামোতে নমনীয়তা উত্তম সংগঠনের পরিচায়ক।

১৬. ব্যতিক্রম নীতি (Principle of Exception) ঃ প্রতিষ্ঠানে এমনকিছু কাজ বিদ্যমান থাকে যা অন্য সাধারণ কার্যাবলী থেকে আলাদা, সেগুলি ব্যতিক্রমী কাজ হিসেবে বিবেচিত। ব্যবস্থাপকগণ দৈনন্দিন সাধারণ কার্যাদি অধস্তনদের দ্বারা সম্পাদন করে থাকে। আর ব্যতিক্রমী সমস্যাগুলি ব্যবস্থাপকগণ সমাধান করে থাকে। তবে সংগঠন কাঠামোতে সে সুযোগ থাকতে হবে।

সুতরাং বলা যায় যে, একটি উত্তম সংগঠনে উপরোক্ত নীতিগুলি বিদ্যমান। এ নীতিগুলি ব্যতীত সংগঠন ফলপ্রসূ হতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবস্থাপনার সংগঠনের সংজ্ঞা, সংগঠনের গুরুত্ব বা প্রয়াজনীয়তা, ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নীতি বা আদর্শ খাতায় লিখুন এবং আপনার জ্ঞান ঝালাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ:

সংগঠন হচ্ছে ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক যোগাযোর্গ সৃষ্টি, তাদের কার্যাবলি সনাক্ত করে এগুলোর শ্রেণীবদ্ধকরণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয়সাধনকে সংগঠন বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের কর্মী পর্যন্ত প্রত্যেকের কাজ ও দায়িত্ব কি হবে, এদের ভেতরকার সম্পর্ক, কতটুকু দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে, কার কি পদ বা পদমর্যাদা হবে তা সবকিছুই নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সংগঠন হচ্ছে (১) প্রয়োজনীয় কাজ চিন্তিতকরণ ও শ্রেণীবিভাগ করা, (২) কাজকে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাগে ভাগ করা, (৩) প্রত্যেকটি ভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে তত্ত্বাবধান করার মত কর্তৃত্ব সহযোগে অর্পন করা ও (৪) সংগঠন কাঠামোর মধ্যে সমান্তরাল ও ঘাড়াখাড়ি ভাবে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা। সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি কাজ ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সংগঠন কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে নতুন নতুন পন্থা পদ্ধতি, সূত্র, নিয়ম অথবা উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয় উন্নয়নে ও প্রয়োগে যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

পাঠ-৭.২ সংগঠনের প্রকারভেদ, অনানুষ্ঠানিক সংগঠন কিভাবে সৃষ্টি হয়?

Types of Organization, How does Informal Organization Emerge?

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠনের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনানুষ্ঠানিক সংগঠন কিভাবে সৃষ্টি হয়? সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সংগঠনের প্রকারভেদ

Types of Organization

সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার একটি প্রণালীকে সংগঠন বলা যায়।তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী চিহ্নিতকরণ, কার্যাবলী শ্রেণীবদ্ধকরণ, উপকরণসমূহ একত্রীকরণ, শ্রেণীবদ্ধ প্রত্যেক কাজের বা বিভাগের জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃব্য নির্ধারণ ও প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলে।সংগঠনকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(ক) আনুষ্ঠানিক সংগঠন (Formal organization)

(খ) অনানুষ্ঠানিক সংগঠন (Informal organization)

(গ) কমিটি (Committee)

(ক) আনুষ্ঠানিক সংগঠন (Formal organization) ঃ প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মনীতির গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রতিষ্ঠানের নিচস্তর থেকে শীর্ষস্তর পর্যন্ত কর্তৃত্বের বা আদেশের যে শিকল প্রস্তুত (chain of command) করা হয়, তাকেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়। এখানে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, কে কার নিকট দায়ী থাকবে এবং জবাবদিহি করবে তার রুপরেখা, কে কার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে তার নিয়মকানুন, কর্মীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার স্তরবিন্যাস-এ সব কিছুই এ সংগঠনে উপস্থিত থাকে। এখানে একজন কর্মী ইচ্ছা করলেই তার উপরস্থ নির্বাহীকে বাদ দিয়ে আরো উপরের স্তরের নির্বাহীর সাথে আলাপ করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত সবাইকে নির্ধারিত দায়িত্ব সবাইকে অবশ্যই পালন করতে হয়। দায়িত্বের অবহেলার জন্য শাস্তির বিধান থাকে। নানারকম আনুষ্ঠানিক সংগঠন যেমন সরলরৈখিক, কার্যভিত্তিক, সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন ইত্যাদি এরূপ প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়।

Chyter I. Baruard এর মতে, "নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যার্জনের জন্য যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কার্যাবলিকে সচেতনভাবে সমন্বিত করা হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলে।" (An organization, when that activities of two or more persons are conciously co-ordinated towards a given objectives.)

সুতরাং বলা যায় যে, যখন কতিপয় লোক আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের অধীনে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের ছঁকের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যার্জনের জন্য পারস্পারিকভাবে প্রচেষ্টা চালায়, তখন তাকে আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলে।

(খ) অনানুষ্ঠানিক সংগঠন (Informal organization) ঃ কোনরূপ আনুষ্ঠানিক প্রথা ছাড়াই সংগঠনের কর্মী ও নির্বাহীদের ব্যক্তিগত মেলামেশলা, খেয়াল-খুশি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দ থেকে অনানুষ্ঠানিক ভাবে যে সম্পর্ক বা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হয় তাকেই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়। এই অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক নির্বাহীদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে কিংবা শ্রমিক সংঘের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সচেতন বা অবচেতন ভাবে গড়ে ওঠে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন

পর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের মধ্যে উপদল গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতঃ আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠনিক কাঠামোতে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের উল্লেখ না থাকলেও অনেক সময় উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাপারে এবং অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারেও অনানুষ্ঠানিক সংগঠন খুবই সহায়ক হয়।

Chester I. Barsaed-এর মতে, "আনুষ্ঠানিক সংগঠন হচ্ছে যৌথ ব্যক্তিগত কার্যসমষ্টি যার কোন যৌথ সচেতন উদ্দেশ্য নেই যদিও যৌথ সম্ভাব্য ফলাফলে অবদান রাখে। (Informal organization is a joint personal activity without conscious joint purpose eventhough pollibly contributing to joint result)

অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের প্রকারভেদ ঃ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমনঃ

(১) বন্ধুত্বসুলভ অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন;

(২) কর্ম গোত্রভুক্ত অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন; নিচে এদের ব্যাপারে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) বন্ধুত্ব সুলভ অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক কর্মীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ফলে এসকল কর্মী একে অপরের সাথে সহযোগিতা ও যোগাযোগ করে এবং একে অপরের কার্যদ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই প্রতিষ্ঠানে যখন এরূপ দলের অস্তিত্ব থাকে তখন দেখা যায় একজন কর্মী তার বন্ধুকর্মীর কাজের সহযোগিতা করছে বা তার কাজে প্রভাব বিস্তার করছে।

(২) কর্ম-গোত্রভুক্ত অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন

অন্য এক প্রকার অনিয়মতান্ত্রিক সংগঠন দেখা যায় যেগুলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে গড়ে ওঠে। সাধারণতঃ যে সব কর্মী খুব ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে কার্য সম্পাদন করে, তাদের মধ্যে এরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে।

আনুষ্ঠানিক সংগঠনকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সরলরৈখিক সংগঠন (Line organization)

২. সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন (Line and Staff organization)

৩. কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional organization)

৪. কমিটি (Committee)

নিচে বিভিন্ন প্রকার আনুষ্ঠানিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

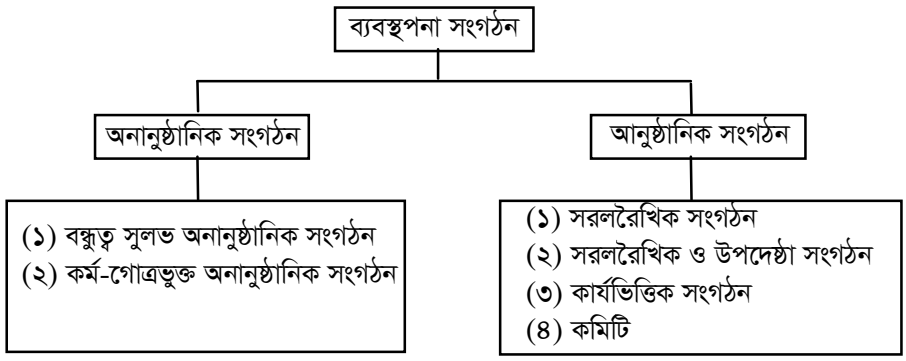

চিত্র ঃ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রকারভেদ।

অনানুষ্ঠানিক সংগঠন কিভাবে সৃষ্টি হয়?

How does the Informal Organization Emerge?

পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণে অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের অভ্যন্তরে কর্মীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংগঠনই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন। বিভিন্ন কারণে এ সংগঠন গড়ে উঠে। কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. কাজের প্রকৃতি (Nature of Works) ঃ কাজের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মীর কাজ অন্য কর্মী থেকে আলাদা হলে সেখানে এ ধরনের সংগঠন গড়ে উঠে না। কারণ সেখানে পারস্পারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে না। যেমন– দারোয়ানের সাথে হিসাব রক্ষকের সম্পর্ক গড়ে উঠে না। কারণ দু'জনের কাজের ধরন দু'রকম।

২. কাজের প্রযুক্তি (Technology of Job) ঃ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজের প্রযুক্তি বা কলাকৌশল ভিন্ন ভিন্ন হলে সেখানে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠে না। যেমন– একজন অন্যজনের নিকটে থেকেও মেশিনের আওয়াজে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। ফলে এ ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠে না।

৩. অস্থিতিশীলতা (Flexibility) ঃ যে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ স্থিতিশীল নয়, তাদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠে না। কারণ স্থিতিশীল না হলে একজন আরেকজনকে বুঝতে পারে না।

৪. বয়স (Age) ঃ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশি হলে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠে না। কারণ বয়সের পার্থক্যের কারণে মনমানসিকতা ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

৫. সামাজিক কারণ (Social Cause) ঃ বিভিন্ন সামাজিক কারণে, যেমন– ধর্মীয় বিশ্বাস, জন্মস্থান, ভাষা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

৬. রাজনৈতিক মতাদর্শ (Political Ideology) ঃ একই ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠার সহায়ক। কারণ তাদের মধ্যে সহমর্মিতার ভাব বেশি হয়।

৭. নেতৃত্ব (Leadership) ঃ কোন কোন নেতার মোহনীয় নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব অনানুষ্ঠানিক সংগঠন সৃষ্টির সহায়ক। কারণ এ ধরনের নেতাকে কর্মীগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে ও ভালবাসে।

৮. মর্যাদা (Status) ঃ বিশেষ মর্যাদা লাভের প্রত্যাশায় কর্মীগণ অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত কারণে কোন প্রতিষ্ঠানে অনানুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে উঠে। তবে কর্মীগণের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণের অকাংখাই এ সংগঠন গড়ে উঠার জন্য দায়ী।

শিক্ষার্থীর কাজ	সংগঠনের প্রকারভেদ , অনানুষ্ঠানিক সংগঠন কিভাবে সৃষ্টি হয়? সে সম্পর্কে বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

সংগঠনকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। আনুষ্ঠানিক সংগঠন, অনানুষ্ঠানিক সংগঠন, কমিটি ।প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মনীতির গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তর থেকে শীর্ষস্তর পর্যন্ত কর্তৃত্বের বা আদেশের যে শিকল প্রস্তুত (chain of command) করা হয়, তাকেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়। এখানে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, কে কার নিকট দায়ী থাকবে এবং জবাবদিহি করবে তার রুপরেখা, কে কার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে তার নিয়মকানুন, কর্মীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার স্তরবিন্যাস-এ সব কিছুই এ সংগঠনে উপস্থিত থাকে। এখানে একজন কর্মী ইচ্ছা করলেই তার উপরস্থ নির্বাহীকে বাদ দিয়ে আরো উপরের স্তরের নির্বাহীর সাথে আলাপ করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কোনরূপ আনুষ্ঠানিক প্রথা ছাড়াই সংগঠনের কর্মী ও নির্বাহীদের ব্যক্তিগত মেলামেশলা, খেয়াল-খুশি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দ থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে যে সম্পর্ক বা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হয় তাকেই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বলা হয়।

পাঠ-৭.৩ সরলরৈখিক সংগঠন, সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন

Line organization, Line and Staff organization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সরলরৈখিক সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সরলরৈখিক সংগঠন

Line organization

শুধুমাত্র সরলরৈখিক কর্মকর্তা অথবা কর্তৃত্ব সহকারে যে সংগঠন কাঠামো গঠিত হয় অর্থাৎ যে সংগঠন কাঠামোতে সরলরৈখিক নির্বাহীর সাথে কোন সহযোগী বা উপদেষ্টা কর্মী থাকে না, তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে। এটি কাঠামো সবচাইতে সহজ ও পুরাতন সংগঠন কাঠামো।

প্রকৃত অর্থে, যে সংগঠন পদ্ধতিতে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব রেখা কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তর হতে সরল রেখার মত উপর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, তাকে সরল রৈখিক সংগঠন বলা হয়। সামরিক সংগঠনে উর্ধ্বতনের আদেশ অধীনস্থরা বিনা দ্বিধায় মানতে যেভাবে বাধ্য থাকে, সরলরৈখিক সংগঠনে আদেশদান এবং তা পালনে অনুরূপ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় বলে একে সামরিক সংগঠনও বলা হয়।

এই ধরনের সংগঠনে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুন্দরভাবে বর্ণিত থাকে এবং আদেশ ও নির্দেশদানের জন্যও সুনির্দিষ্ট পথরেখা থাকে। এই নির্দিষ্ট পথরেখা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ অধীনস্থ কর্মচারীদের দিকে প্রবাহিত হয়। রৈখিক কর্মকর্তাদের সাহায্যের জন্য কোন উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা থাকে না।

সরলরৈখিক সংগঠনের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি বিভাগের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপবিভাগ তৈরী করা হয়। এসব বিভাগ এবং উপ-বিভাগে একজন করে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকেন। এই কর্মকর্তাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন যাবতীয় কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তিনি তার অর্ধস্তনদের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখেন।

শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কর্তৃত্ব অর্পন করেন আর এভাবেই সংগঠনের শীর্ষস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের লম্ব রেখার সৃষ্টি হয়। নিম্নে চিত্রে সরলরৈখিক সংগঠনের একটি কাল্পনিক নমুনা প্রদান করা হলো ঃ

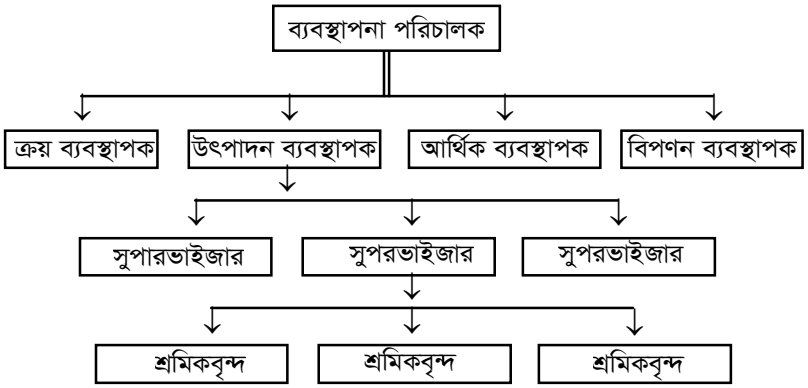

চিত্র ঃ সরলরৈখিক সংগঠন

প্রাচীনতম সংগঠন পদ্ধতি হিসেবে সরলরৈখিক সংগঠন এমন কিছু বৈশিষ্টের অধিকারী যার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আজ পর্যন্তও এটি একটি গ্রহণযোগ্য সংগঠন কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়। নিচে এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. এটি সবচাইতে সরল এবং সহজবোধ্য সংগঠন কাঠামো।

২. এ ধরনের সংগঠন কাঠামোতে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব শীর্ষ ব্যবস্থাপনা স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে নিচু স্তরের ব্যবস্থাপনার দিকে সরলরেখার মত নেমে আসে। ফলে সংগঠনে একটি উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৩. এই সংগঠন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলীকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এর প্রতিটি বিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পৃথক ভাবে তাদের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করে।

৪. এই প্রকার সংগঠন কাঠামোতে অধঃস্তন নির্বাহী শুধুমাত্র তার অব্যবহিত উর্ধ্বতনের আদেশ মানতে বাধ্য থাকে এবং অর্পিত কাজের জন্য শুধুমাত্র উপরের উর্ধ্বতনের নিকট জবাবদিহি করে।

৫. এই প্রকার সংগঠনে প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন বিভাগীয় দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় এবং সব বিভাগ একজন সাধারণ ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

৬. এই প্রকার সংগঠনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনে এক বিভাগ অন্য বিভাগের সাথে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করে বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে।

৭. এ ধরনের সংগঠনে উর্ধ্বতন নির্বাহী তার নিচের অধীনস্থের উপর অধিক মাত্রায় কর্তৃত্ব আরোপ করে।

৮. এই সংগঠনের ক্ষেত্রে একজন নির্বাহীর দক্ষতা তার অধীনে ন্যস্ত বিভাগ বা সংগঠনকে অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করে।

৯. এই প্রকার সংগঠনে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য সঠিক ভাবে অর্জন করার জন্য একজন নির্বাহীকে অধিক মাত্রায় দয়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। এজন্য দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বার্পনে সমতা বিধান সরলরৈখিক এবং সংগঠনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন

Line and Staff organization

বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন এবং সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে সরলরৈখিক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ বা পদস্থ কর্মীদের নিয়ে যে নতুন ধনের সংগঠন কাঠামো গড়ে উঠেছে তাকেই সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন বলে।

আরও সহজভাবে বলতে গেলে এটা এমন এক ধরনের সংগঠন যাতে সরলরৈখিক কর্মকর্তাকে যথোপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। এরূপ সংগঠনে উপদেষ্টাগণ শুধু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে থাকেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আদেশ নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা তাদের থাকে না। এক্ষেত্রে সরলরৈখিক কর্মকর্তারাই সমস্ত ব্যবস্থাপকীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শ বা উপদেশ কার্যকরী করা বা না করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সংগঠনের জটিল টেকনিক্যাল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রৈখিক কর্মকর্তাগণ উপদেষ্টাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করেন। রৈখিক কর্মকর্তাগণ নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বিধান করেন এবং উপদেষ্টাগণ কি করা উচিত সে ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন। এই ধরনের সংগঠনে রৈখিক কর্মকর্তাগণ পণ্য উৎপাদন সুনিশ্চিত করেন, অপর দিকে বিশেষজ্ঞ কর্মীগণ গবেষণা, পরিকল্পনা, গণসংযোগ, শিল্প সম্পর্ক, কারিগরি প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এখানে বিশেজ্ঞগণ রৈখিক কর্মকর্তাদের উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন না। অবশ্য সংগঠনে বিশেষজ্ঞ কর্মীদের গুরুত্ব থাকায় রৈখিক কর্মকর্তাগণ তাদের উপদেশ ও পরামর্শ মেনে চলেন।

G. R. Terry-এর মতে, "যখন সরলরৈখিক নির্বাহী ও উপদেষ্টা নির্বাহী উভয়কে যে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অর্থাৎ সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন হবে।" (When both line and staff authorities are included in an organization, it is known as a line and staff organization)

সুতরাং বলা যায় যে, সংগঠন কাঠামোতে সরলরৈখিক নির্বাহী ও উপদেষ্টাগণ যে পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়, তাকে

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন বলা হয়।

নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন কাঠামো প্রদর্শন করা হল।

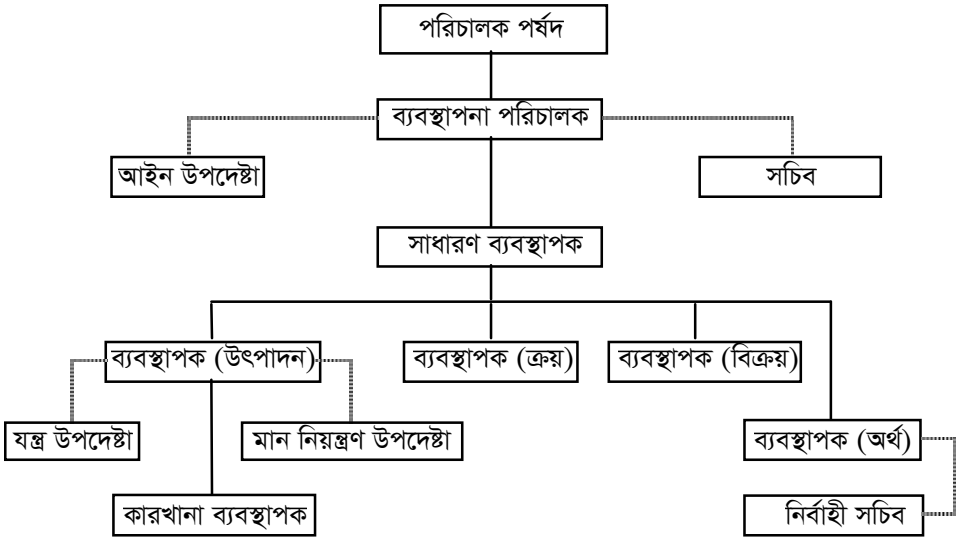

এখানে _____ সরলরৈখিক নির্বাহী

..... উপদেষ্টা

চিত্র ঃ সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ঃ

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনের নিচ লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়-

১. এই সংগঠনে দুধরনের কর্মী থাকে, একদল সরলরৈখিক কর্মী বা নির্বাহী এবং অন্যদল উপদেষ্টা কর্মী।

২. এই সংগঠনের কর্তৃত্ব রেখা ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর হতে ক্রমশ নিচস্তরে নেমে আসে, তবে সরলরৈখিক নির্বাহীর পাশে উপদেষ্টা কর্মীগণ প্রয়োজনীয় অবস্থান ও পদ গ্রহণ করেন।

৩. এই সংগঠনে দুই ধরনের কর্মী থাকলেও সরলরৈখিক কর্মকর্তাগণই ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

৪. এখানে উপদেষ্টা কর্মীদের কাজ হল সরলরৈখিক কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান এবং কার্যক্ষেত্রে সহযোগীতা করা।

৫. উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মীদের দেওয়া উপদেশ ও পরামর্শ সংগঠনের রৈখিক নির্বাহীগণ মানতে বাধ্য থাকে না তবে উপদেষ্টাদের বিশেষ গুরুত্ব থাকায় তা মেনে চলা হয়।

৬. এই প্রকার সংগঠনে একজন অধীনস্থ নির্বাহী তার কাজের জন্য কেবলমাত্র তার অব্যবহিত উপরের নির্বাহীর নিকট দায়ী হয় এবং তারই নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকে।

৭. তুলনামূলকভাবে বৃহদায়তন ও জটিল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠন কাঠামো ব্যবহৃত হয়।

সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠনের প্রয়োগ ক্ষেত্র

Fields of the Line and Staff Organization

বর্তমান যুগ হলো বিশেষায়নের যুগ। তাই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র সরলরৈখিক নির্বাহী দ্বারা সুষ্ঠভাবে কার্য সম্পাদন করা তথা পরিচালনা করা সম্ভব

হয় না। তাই তাদের পাশাপাশি উপদেষ্টাদের প্রয়োজন হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সরলরৈখিক উপদেষ্টা সংগঠন অত্যন্ত কার্যকর। নিচে এ সকল ক্ষেত্র উলেøখ করা হলো ঃ

১. জটিল ও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান (Complex & Large Scale Organization) ঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান বড় আকারের, সে সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে অনেক লোক কাজ করে। ফলে এ প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা জটিল ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে লাইন নির্বাহীদেরকে সহযোগীতার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। সুতরাং জটিল বৃহদায়নের প্রতিষ্ঠানে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন কাঠামো প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ– যে কোন কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলের কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে তুলা থেকে সূতা, সূতা থেকে কাপড় তৈরি করা হয় এবং রং করা হয়। সুতরাং এখানে কতকগুলো বিভাগ এক সাথে কাজ করে। এর একেকটি বিভাগের জন্য একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। এ ধরনের বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য অবশ্যই সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন কাঠামো প্রয়োগ করা যথোপযুক্ত হবে।

২. বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন (Necessity of Specialized Knowledge) ঃ বড় প্রতিষ্ঠানে কিছু বিভাগ থাকে, যেখানে বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে সরলরৈখিক নির্বাহীগণ সেই বিভাগগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে না। তাই এ সকল বিভাগে বিশেষায়িত উপদেষ্টার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ–বলা যায় যে, এ্যারোমেটিক কসমেটিক' বিভাগে অনেক দামী স্বয়ংক্রিয় মেশিন রয়েছে যা রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজে দক্ষ প্রকৌশলী প্রয়োজন। তাঁরা উৎপাদন ব্যাবস্থাপককে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দেবে যে, সঠিকভাবে উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য কি করা প্রয়োজন। অতএব এ ধরনের বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন কাঠামো প্রয়োগ করতে হবে।

৩. কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণ (Functional Departmentation) ঃ বড় আকারের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে কার্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন– অর্থ বিভাগ, মানবসম্পদ বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, হিসাব বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ ইত্যাদি। হিসাব বিভাগের জন্য অবশ্যই বিভাগীয় প্রধানকে সি. এ, পাস করা একজন সহযোগী নির্বাহী (Staff) নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও ডিজাইনিং, মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost Control) ইত্যাদি কাজের জন্য বিশেষায়িত উপদেষ্টা নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

৪. অতিরিক্ত কর্মভারগ্রস্ত নির্বাহী (Overburdened Executive) ঃ এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে নির্বাহীদেরকে প্রচুর কাজ করতে হয়। অতিরিক্ত কাজ করতে হয় বিধায় নির্বাহীগণের পক্ষে অনেক সময় সঠিকভাবে সব কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই তাঁদেরকে সহযোগীতা করার জন্য সহযোগী নির্বাহী (Staff) নিয়োগ করা হয়।

৫. আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠান (Financially Solvent Organization) ঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, সে সকল প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠভাবে কার্যসম্পাদনের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। উপদেষ্টা নিয়োগ করা ব্যয়বহুল বিধায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপদেষ্টা নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সব ধরনের মাঝারি ও বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানেই সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন কাঠামো ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সরলরৈখিক সংগঠন, সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন সম্পর্কে বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

শুধুমাত্র সরলরৈখিক কর্মকর্তা অথবা কর্তৃত্ব সহকারে যে সংগঠন কাঠামো গঠিত হয় অর্থাৎ যে সংগঠন কাঠামোতে সরলরৈখিক নির্বাহীর সাথে কোন সহযোগী বা উপদেষ্টা কর্মী থাকে না, তাকে সরলরৈখিক সংগঠন বলে। এটি কাঠামো সবচাইতে সহজ ও পুরাতন সংগঠন কাঠামো।

প্রকৃত অর্থে, যে সংগঠন পদ্ধতিতে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব রেখা কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তর হতে সরল রেখার মত উপর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, তাকে সরল রৈখিক সংগঠন বলা হয়।

বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন এবং সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে সরলরৈখিক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ বা পদস্থ কর্মীদের নিয়ে যে নতুন ধনের সংগঠন কাঠামো গড়ে উঠেছে তাকেই সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন বলে।

বর্তমান যুগ হলো বিশেষায়নের যুগ। তাই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র সরলরৈখিক নির্বাহী দ্বারা সুষ্ঠভাবে কার্য সম্পাদন করা তথা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাই তাদের পাশাপাশি উপদেষ্টাদের প্রয়োজন হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সরলরৈখিক উপদেষ্টা সংগঠন অত্যন্ত কার্যকর।

পাঠ-৭.৪ কার্যভিত্তিক সংগঠন , কমিটি, ম্যাট্রিক্স সংগঠন
Functional Organization, Committee, Matrix Organization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সরলরৈখিক সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কমিটি সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ম্যাট্রিক্স সংগঠন সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

কার্যভিত্তিক সংগঠন
Functional Organization

কোন প্রতিষ্ঠানের মোট কার্যকে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে এক এক বিভাগে এক একজন করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে শীর্ষ পদে নিযুক্ত করা হলে এবং উক্ত বিভাগ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পন করা হলে তাকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে। এই ধরনের সংগঠনে বিশেষজ্ঞদেরকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ না করে সরাসরি নির্বাহী হিসেবে বিশেষ দায়িত্বে আসীন করা হয়। কারণ এটি একটি বিশেষায়িত সংগঠন।

বস্তুতঃ পক্ষে বিশেষজ্ঞদেরকে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সরলরৈখিক কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমেই কার্যভিত্তিক সংগঠনের জন্ম হয়, কার্যভিত্তিক সংগঠনে বিশেষায়ন ও শ্রমবিভাগের নীতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটে। এক্ষেত্রে বিশষজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন। এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর থেকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মের কর্মনায়কদের উপর নেমে আসে। প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ তাদের উপর অর্পিত এক একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য মুখ্য কার্যনির্বাহীর কাছে দায়ী থাকেন। এ ধরনের সংগঠনে শ্রমিকদের একাধীক নির্বাহীর অধীনে কাজ করতে হয়। মূলত সরলরৈখিক সংগঠনের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যস্থাপনার জনক এফ. ডব্লু, টেলর কার্যভিত্তিক সংগঠনের প্রচলন করেন।

নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে কার্যভিত্তিক সংগঠনের একটি কাল্পনিক চিত্র প্রদর্শন করা হলো ঃ

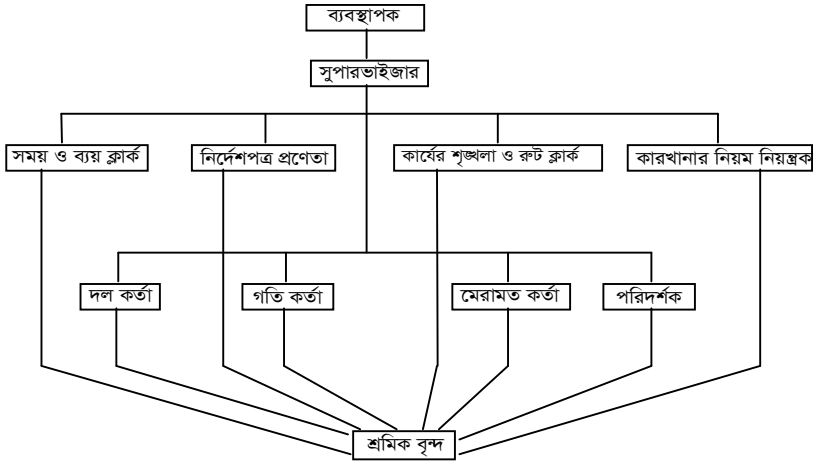

চিত্র ঃ এফ. ডব্লিউ. টেলরের কার্যভিত্তিক সংগঠন

কার্যভিত্তিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

কার্যভিত্তিক সংগঠনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ঃ

১. এই প্রকার সংগঠনে কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সব কাজকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায় (যেমন, উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)

২. এই সংগঠনে প্রত্যেকটা বিভাগের দায়িত্বে এক এক জন বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত থাকেন, এই বিশেষজ্ঞ তার উচ্চ স্তরে কর্মরত লাইন কর্মকর্তার নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার কর্তৃত্ব ভোগ করেন।

৩. এই সংগঠনে কর্তৃত্ব ও কর্তব্য বন্টন বিশেষায়নের ভিত্তিতে করা হয়।

৪. এই ধরনের সংগঠনে একজন শ্রমিক বা কর্মীকে একাধীক কর্মকর্তার অধীনে কাজ করতে হয়।

৫. এই সংগঠনের কর্তৃত্ব উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার সর্বনিচ স্তরে অবস্থিত ফোরম্যানগণ নিজেদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

৬. এই ধরনের সংগঠনে কর্মক্ষেত্র সীমিত হলেও কর্তৃত্বের পরিধি অসীম।

৭. এ ধরনের সংগঠনে একজন কর্মী কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জন করেন।

৮. আধুনিক বৃহৎ ও জটিল প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠনের বেশী প্রয়োগ দেখা যায়।

কমিটি

Committee

কমিটি বা পর্ষদ হচ্ছে একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন যার ওপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশাসনিক দায়িত্ব বা কোন কার্যভার অর্পিত হয়। বর্তমান জগতে সব ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মকান্ডে এটা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুতঃ কমিটিকে গণতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক হিসেবে চিহ্নিত করাহয়। কমিটিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে তাকে। টিম (Team), পর্ষদ (Board), টাস্ক ফোর্স (Task force), কমিশন (Commission) পরিষদ (Board) ইত্যাদি হচ্ছে কমিটির বিভিন্ন রূপ। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে কমিটির কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল ঃ

প্রফেসর ডব্লিউ, এইচ নিউম্যান (W. H. Newman) এর মতে, "কমিটি হল একদল লোকের সমষ্টি যাদের ওপর নির্দিষ্টভাবে প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করা হয়।"

অইরিখ ও কুঞ্জ (Weihrich and Koontz) বলেন, 'কমিটি হল কতিপয় ব্যক্তি সমষ্টি যাদেরকে দলবদ্ধভাবে তথ্য সরবরাহ পরামর্শ প্রদান, ধারণার বিনিময় অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব অর্পন করা হয়।"

সাধারণত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কতিপয় বিশিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। এটা সমিষ্টিগতভাবে কাজ করে এবং কার্য সম্পাদনের জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করেন। শুধুমাত্র কমিটির দায়িত্ব পালন কোন সদস্যের মুখ্য কাজ নয়। প্রত্যেক সদস্যেরই নিজ নিজ দায়িত্ব থাকে যা তাদের প্রধান কাজ বলে গণ্য হয়। আর এই মূল দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে সদস্যরা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের সুবিধার্থে সদস্যদের একজনকে সভাপতি বা আহ্বায়ক মনোনিত করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

উপরের আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে, কমিটি হলো বিশেষভাবে নির্বাচিত বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনিত এমন কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যাদের ওপর বিশেষ কোন প্রশাসনিক কাজ বা দায়িত্বভার অর্পন করা হয় এবং যারা সু-সংগঠিত ভাবে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।এখানে উল্লেখ্য যে, একটি কমিটি অবশ্যই একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সমস্যা তদন্তের জন্য "এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি" গঠন করা হয়ে থাকে। এটা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার কমিটির আওতায় পড়ে না।

কমিটির বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞাসমূহ এবং কমিটির স্বাভাবিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে যেসব বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে আমাদের নিকট লক্ষ্যণীয় তা নিচরূপঃ

১. কমিটি হলো সাধারণত কতিপয় (একাধিক) ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার সংগঠন।

২. একটি কমিটির সদস্যগণ সাংগঠনিক নিয়মে নির্বাচিত বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

৩. সাধারণত একটি কমিটিতে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হন।

৪. কমিটির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কমিটির বাইরেও নির্ধারিত কাজ থাকে।

৫. একটি কমিটি স্থায়ী বা অস্থায়ী যেকোন ধরনের হতে পারে।

৬. কমিটির সদস্যরা এতে সমমর্যাদা ভোগ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতির অনুসরণ করা হয়।

কমিটির সুবিধা বা কমিটি ব্যবহারের কারণ

সাধারণত নিম্নোক্ত সুবিধার কারণেই একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১. ইংরেজীর একটি প্রচলিত কথা হচ্ছে"Two heads are better than one." বাস্তবে একটি কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা ও স্বাধীন মত বিনিময়ের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। যার ফলে প্রতিষ্ঠান উপকৃত হতে পারে।

২. একটি কমিটিতে সবসময় গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়। কমিটিতে সব সদস্যই সমান মূল্যায়ন লাভ করে এবং সবার গুরুত্ব সমান। এক্ষেত্রে সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা উর্ধ্বতন নির্বাহীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

৩. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনে কমিটি বিশেষ সহায়তা করে। বিভিন্ন বিভাগ হতে আগত ব্যক্তিদের সমন্বয় গঠিত কমিটিতে প্রত্যেক বিভাগের সমস্যা উপস্থিত হয় এবং তাদের সমবেত প্রচেষ্টা। আন্তরিক সহযোগিতা ও চমৎকার সমঝোতার কারণে তাদের বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা ও যাবতীয় কার্যাবলী সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়।

৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটির সব সদস্যের কমবেশী অবদান থাকে। ফলে সব সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা লাভ করা যায়।

৫. বিশেষ ক্ষেত্রে কমিটিতে বহিরাগত বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা তাদের বিশেষজ্ঞ জনিত মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এর ফলে জটিল সমস্যা সমাধান ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

৬. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে তথ্যাদি পরিবেশনের জন্য কমিটি অত্যন্ত উপযোগী। কমিটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাবলী ব্যাখ্যা সহকারে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট পরিবেশন করে যা সময় ও অর্থ দুইটিই সাশ্রয় করে।

৭. কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা যেহেতু অনেকের উপর অর্পিত হয় সেহেতু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কার্যভার লাঘব হয়। এভাবে বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা অর্জন করা যায়।

৮. কমিটি গঠনের ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের স্বার্থ সমুন্নত থাকে। এতেকরে ঐ প্রতিষ্ঠানে একটি ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করে।

৯. অধীনস্থদের নিয়ে গঠিত কমিটিতে তাদের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা বা নির্দেশনা বাস্তবায়নের কাজকে অধঃস্তনরা তাদের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে যা তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে।

১০. কমিটির সদস্যদের যথাযোগ্য পদমর্যাদা ও সম্মান দান করা হয়ে থাকে। এতে প্রত্যেক সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর কর্মীদের মনোবলও বেড়ে যায়।

কমিটির অসুবিধা

একটি কমিটির নিচরূপ অসুবিধা দেখা দেয়ঃ

১. কমিটির সদস্যগণ সাধারণত নিজ নিজ রুটিন ওয়ার্ক সম্পাদনের পর কমিটির কাজে এগিয়ে আসেন। ফলে জরুরী প্রয়োজনে তাদের একত্রিত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন বিলম্বিত হয়। এছাড়াও সকলের মতামত শোনার পর সিদ্ধান্তে পৌছতে হয় যা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

২. অনেক সময় কমিটির প্রত্যেক সদস্য প্রতিটি বিষয়ে তার মতামত প্রদানের বিষয়কে অধিকার বলে মনে করে। এতে উর্ধ্বতন নির্বাহীদের সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। ফলে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার চিড় ধরতে পারে।

৩. প্রকৃতপক্ষে কমিটিতে কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাদের সাথে যুক্তি-তর্কে অথবা উপমায় সংখ্যাগুরু সাধারণ সদস্যগণ বিভ্রান্ত ও হতাশা হয়ে পড়ে। ফলে কতিপয় প্রভাবশালী সদস্যরাই কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

৪. কমিটির কার্যাবলী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি করে থাকে। আপ্যায়ন, সম্মানী, অন্যান্য ভাতাদি ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়, কমিটির সিদ্ধান্তের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে তা বেশি হয়ে থাকে। এছাড়াও মিটিং এ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণ শ্রমঘন্টা ব্যয় হয়।

৫. অনেক সময় দেখা যায় যে কমিটি গঠনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পরও কিছু কিছু কমিটি থেকে যায়। এক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা এই কমিটিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়।

৬. একটি কমিটি রাজনৈতিক দূষিত আবহাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজের দল, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকেই বড় করে দেখেন। এর ফলে কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত সর্বসাধারণের অনুকূলে না হয়ে কূটনৈতিক চাল থেকে উদ্ভূত হয়।

৭. অনেক সময়ই কমিটিতে সৃজনশীল চিন্তাধারা বাধাগ্রস্থ হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত কোনপ্রকার বিচার বিবেচনা ছাড়াই ভোটাভুটির মাধ্যমে বিশেষ গণতান্ত্রিক রীতির কারণে পাশ হয়। কখন কখনও প্রভাবশালী সদস্যের কথার বাইরে অন্যরা মুখ খুলতে চায় না আবার দায়িত্বে অবহেলার কারণেও অনেকে ভাল পরামর্শ দেয় না।

৮. কমিটির আর একটি বড় অসুবিধা হল এটা প্রায়ই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আলোচিত বিষয়ের উপর সকল সদস্যই মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আলোচনা অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হয়। এতে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

৯. কমিটির আলোচনায় মতামতের ভিন্নতা, সংখ্যালঘু সদস্যদের বাড়াবাড়ি ছাড়াও সকল সদস্যের সিদ্ধান্তের পক্ষে মত লাভের প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই আপোষমূলক সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়। আর এরূপ আপোষমুলক সিদ্ধান্ত বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাল ফল দেয় না।

১০. একটি কমিটির সদ্যদের মধ্যে অনেক সময় উপদল গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতার ফলে মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির উপরেও উপদলীয় স্বার্থ প্রাধান্য বিস্তার করে। এতে সুষ্ঠু সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যহত হয়।

ম্যাট্রিক্স সংগঠন

Matrix Organization

ম্যাট্রিক্স সংগঠন হলো একটি আধুনিক ও জটিল সংগঠন কাঠামো। সাধারণতঃ বড় আকারের ও জটিল প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠন কাঠামো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি এমন এক ধরনের সংগঠন যেখানে একই সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে কার্যভিত্তিক ও প্রকল্প বা পণ্যভিত্তিক বিভাগীয়করণ একত্রিতকরণের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে একই সাথে কার্যভিত্তিক ও বিভাগীয় সংগঠন কাজ করে। এখানে আদেশ দানের দুটি চ্যানেল বা পন্থা রয়েছে। যেমন– খাড়াখাড়ি ও সমান্তরাল। যে কোন আদেশ বা নির্দেশ উক্ত দুটি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এ সংগঠনে দু'ধরনের নির্বাহী কাজ

করেন। এক ধরনের নির্বাহী সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজ তদারকি করেন এবং আরেক ধরনের নির্বাহীগণ কারিগরি বিষয়সমূহ দেখাশুনা করেন। এ ধরনের সংগঠন সাধারণতঃ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, এয়ারোস্পেস শিল্প, তেল কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বেশি ব্যবহৃত হয়ে তাকে।

Bartol & Martin- এর মতে, "ম্যাট্রিক সংগঠন হলো এমন এক ধরনের সংগঠন কাঠামো যেখানে পর্যায়ক্রমিক কর্তৃত্বের প্রবাহসম্বলিত কার্যভিত্তিক সংগঠনের উপর সমান্তরাল বিভাগীয় কাঠামোর সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করা হয়।" (Matrix structure is a structure that superimposes a horizontal set of divisional reporting relationships onto a hierarchical functional structure)

Griffin- এর মতে, "এটি এমন এক সংগঠন নক্সা যেখানে পণ্য ভিত্তিক বিভাগীকরণকে বিদ্যমান কার্যভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থার উপর প্রতিস্থাপন করা হয়।" (An Organization design where in a product based form of departmentalization is superimposed on to an existing functional arrangement)

James A. F Stoner ও সহযোগিদের মতে, "ম্যাট্রিক্স সংগঠন হলো এমন এক ধরনের সংগঠন কাঠামো যেখানে প্রতিটি কর্মী কার্যভিত্তিক বা বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক বা গ্রুপ ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করে।" (An Organization structure in which employee reports to both a functional or division manager and to a project or group manager)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ম্যাট্রিক্স সংগঠনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন–

(১) এটি একটি মিশ্র কাঠামো যেখানে খাড়াখাড়ি কার্যভিত্তিক ও সমান্তরাল বিভাগীয় কাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকে।
(২) এটিকে বহুমুখী আদেশ দানের কাঠামো বলা হয়।
(৩) এখানে উলম্ব ও সমান্তরাল দু'ধরনের কর্তৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান।
(৪) এখানে প্রত্যেক কর্মীকে দু ধরনের নির্বাহীর নিকটই রিপোর্ট করতে হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, ম্যাট্রিক্স সংগঠন হলো এমন একটি মিশ্র সংগঠন কাঠামো যেখানে কার্যভিত্তিক ও দ্রব্যভিত্তিক সংগঠন কাঠামোকে সমন্বিত করা হয়। নিচে ম্যাট্রিক্স সংগঠনের চিত্র দেয়া হলো ঃ

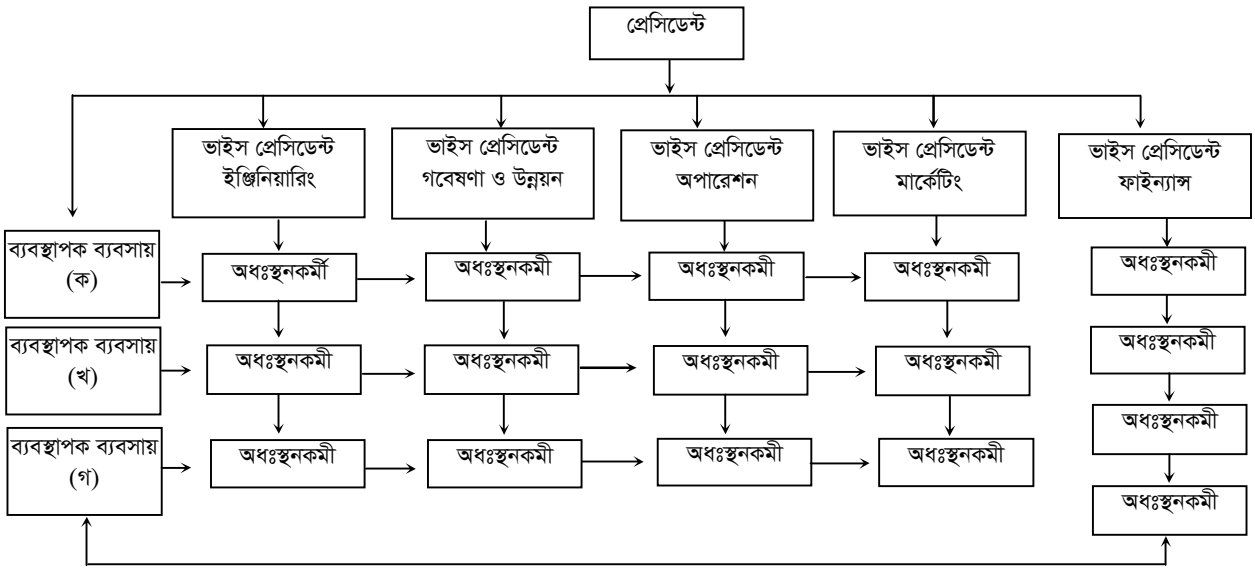

চিত্র ঃ ম্যাট্রিক্স সংগঠন

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভাইসপ্রেসিডেন্ট অপারেশন, মার্কেটিং, ফাইন্যান্স, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যভিত্তিক বিভাগ উপস্থাপন করে যা খাড়াখাড়ি কর্তৃত্ব তৈরি করে। একই সাথে ব্যবসায় 'ক', 'খ' ও 'গ' বিভাগীয় কাঠামো প্রদর্শন করছে যারা একই সংগঠন কাঠামোয় সমান্তরাল কর্তৃত্ব তৈরি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কার্যভিত্তিক সংগঠন , কমিটি, ম্যাট্রিক্স সংগঠন সম্পর্কে বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

কোন প্রতিষ্ঠানের মোট কার্যকে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে এক এক বিভাগে এক একজন করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে শীর্ষ পদে নিযুক্ত করা হলে এবং উক্ত বিভাগ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পন করা হলে তাকে কার্যভিত্তিক সংগঠন বলে। এই ধরনের সংগঠনে বিশেষজ্ঞদেরকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ না করে সরাসরি নির্বাহী হিসেবে বিশেষ দায়িত্বে আসীন করা হয়। কারণ এটি একটি বিশেষায়িত সংগঠন।

'কমিটি হল কতিপয় ব্যক্তি সমষ্টি যাদেরকে দলবদ্ধভাবে তথ্য সরবরাহ পরামর্শ প্রদান, ধারণার বিনিময় অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব অর্পন করা হয়।সাধারণত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কতিপয় বিশিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। এটা সমিষ্টিগতভাবে কাজ করে এবং কার্য সম্পাদনের জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করেন। শুধুমাত্র কমিটির দায়িত্ব পালন কোন সদস্যের মুখ্য কাজ নয়। প্রত্যেক সদস্যেরই নিজ নিজ দায়িত্ব থাকে যা তাদের প্রধান কাজ বলে গণ্য হয়।

ম্যাট্রিক্স সংগঠন হলো একটি আধুনিক ও জটিল সংগঠন কাঠামো। সাধারণতঃ বড় আকারের ও জটিল প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠন কাঠামো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি এমন এক ধরনের সংগঠন যেখানে একই সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে কার্যভিত্তিক ও প্রকল্প বা পণ্যভিত্তিক বিভাগীয়করণ একত্রিতকরণের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে একই সাথে কার্যভিত্তিক ও বিভাগীয় সংগঠন কাজ করে। এখানে আদেশ দানের দুটি চ্যানেল বা পন্থা রয়েছে।

পাঠ-৭.৫ বিভাগীকরণ, বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রকারভেদ কর্তৃত্বার্পণ বা ক্ষমতার্পন, কিভাবে ক্ষমতার্পন করা হয়?

Departmentation, Different Methods of Departmentation, Delegation of Authority, How Authority is Delegated?

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভাগীকরণ, বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্তৃত্বার্পণ বা ক্ষমতার্পন, কিভাবে ক্ষমতার্পন করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিভাগীকরণ

Departmentation

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে নানা ধরণের ও প্রকৃতির কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। বিভাগীকরণ হলো এমন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যাতে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যাবলীকে তাদের প্রকৃতির ভিত্তিতে কতিপয় আলাদা আলাদা এককে বিন্যাস করা হয়। এতে সমজাতীয় কাজগুলোকে এক একটি বিভাগের আওতাধীনে রাখা হয়। বিভাগীকরণের নির্দিষ্ট কোন পথ নেই যা সব সময় এবং সব সংগঠনের জন্য উপযোগী নয়। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এক এক সংগঠন এক এক ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করছে। বিভাগীকরণের ফলে কাজ এবং কর্মীকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে সংগঠনকে অনেক দক্ষ করা যায়।

বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রকারভেদ

Different Methods of Departmentation or Types of Departmentation

সংগঠনের সাফল্য অর্জনের জন্য বিশেষায়িত কাজগুলো সুচারু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংগঠনকে উপবিভাজনের মাধ্যমে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করাকে বিভাগীয়করণ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভাগীকরণের জন্য নানারকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা বিভাগীকরণের বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) সংখ্যার ভিত্তিতে বিভাগীকরণ ঃ এক সময়ে সংখ্যার ভিত্তিতে বিভাগীকরণ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এটি বিভাগীকরণের একটি সহজ ও সাধারণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একই ধরনের কাজ করতে সক্ষম এমন নির্দিষ্ট সংখ্যাক ব্যক্তিকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুবই সীমিত হয়ে পরেছে। কারণ সংখ্যা ভিত্তিক বিভাগীকরণের ব্যবস্থাটি শুরু সংগঠনের নিচু স্তরেই সম্ভব হয় উচু স্তরে নয়।

(২) সময় ভিত্তিক বিভাগীকরণ ঃ এটা বিভাগীকরণের প্রাচীনতম পদ্ধতির একটি। সাধারণতঃ সংগঠনের নিচু স্তরেই এ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক কর্মদিবসে কার্য সম্পাদনের চাহিদা মিটাতে পারে না সেখানে শিফট হিসেবে কাজ করা সময়ভিত্তিক বিভাগীকরণের লক্ষণ। অর্থাৎ এখানে সময়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যের বিন্যাস করা হয়।

(৩) সংগঠনের কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ ঃ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর ভিত্তিতে সাধারণত এই ধরনের বিভাগীকরণ করা হয়ে থাকে। এটি সর্বাধিক ও ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় সমজাতীয় সকল কাজকে এক একটি বিভাগের আওতাধীন করা হয়। এই বিভাগীকরণের মাধ্যমে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের ক্ষমতা ও মান বজায় থাকে। তাছাড়া এই বিভাগীকরণের দ্বারা পেশাগত বিশেষায়ণের নীতি অনুসরণ করা হয় বলে কর্মীদের দক্ষতার যোগ্য ব্যবহার করা যায়।

(৪) অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীকরণ ঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান বৃহৎ আকারের এবং যাদের কার্যাবলী বিভিন্ন এলাকায় সম্পাদন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সেখান অঞ্চল ভিত্তিক বিভাগীকরণের ব্যবহার দেখা যায়। এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ব্যবসা অঞ্চলকে কতিপয় এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার কার্যাবলীর বিন্যাস করা হয়। এতে প্রত্যেক এলাকাতে কার্যাবলীর ভার এক একজন ব্যবস্থাপকের উপর অর্পণ করা হয়।

(৫) পণ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ ঃ এই বিভাগীকরণের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পণ্য শ্রেণী সংক্রান্ত, বিষয়, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি কার্যাবলী এক একটি আলাদা বিভাগে বণ্টন করা হয়। আজকাল বড় বড় প্রতিষ্ঠানে পণ্য বা পণ্যের লাইনভিত্তিক। বিভাগীয়করণ বেশী মাত্রায় গুরুত্ব পাচ্ছে।

(৬) ক্রেতা ভিত্তিক বিভাগীকরণ ঃ ক্রেতাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ক্রেতা ভিত্তিক বিভাগীকরণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ক্রেতাদের বৈশিষ্ট্য ও উপস্থিতি অনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর বিন্যাস করা হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা যেমন, স্ত্রী, পুরুষ, ছাত্র, বৃদ্ধ ইত্যাদি প্রত্যেক শ্রেণীর ক্রেতা সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর ভার আলাদা আলাদা বিভাগে এক একজন কর্মকর্তার উপর অর্পিত হয়। বস্তুতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধানই এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

(৭) বাজারমুখী বিভাগীকরণ ঃ এটা নতুন এক ধরনের বিভাগীকরণ পদ্ধতি, আজকাল প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই বাজারমুখী বিভাগীকরণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। এতে পণ্য যে বাজারে বিক্রয় করা হয় অথবা পণ্য বিক্রয়ে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ ব্যবহার করা হয় তারই ভিত্তিতে বিভাগীকরণ করা হয়। এই বিভাগীকরণের উদ্দেশ্য হলো বাজারজাতকরণ বা বিপণন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা।

(৮) যন্ত্রপাতি ভিত্তিক বিভাগীকরণ ঃ যান্ত্রিক উৎপাদন ভিত্তিক সংগঠনগুলো উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদনে কি ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেই ভিত্তিতে বিভাগীকরণ করে থাকে। এখানে একটি বিভাগের যন্ত্রপাতিও মানুষকে একই বিভাগের একক কাজ পরিচালনার আওতায় নিতে আসা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল ছোট বা বড় প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিভাগ আছে, যা যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রভিত্তিক বিভাগীকরণের একটি উদাহরণ।

(৯) সেবাভিত্তিক বিভাগীকরণ ঃ সংগঠনের কিছু কিছু কাজ এমন আছে যা সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত না হয়েও সংগঠনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। যেমন, কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ, হিসাবরক্ষণ, বিভাগ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগ ইত্যাদি। সুতরাং সংগঠনের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী অংশের মাধ্যমে যে বিভাগীকরণ করা হয় তাকেই সেবাভিত্তিক বিভাগীকরণ বলে।

(১০) মেট্রিক্স বিভাগীকরণ ঃ মেট্রিক্স বিভাগীকরণ হলো কার্যভিত্তিক এবং পণ্য ভিত্তিক বিভাগীকরণের মিশ্রণে সৃষ্ট বিভাগীকরণ পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে যেহেতু সংগঠন ও ভোক্তা সবাই শেষ ফলাফলের জন্য উদগ্রীব সে কারণে প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়নেও মেট্রিক্স বিভাগীকরণ সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করে থাকে।

কর্তৃত্বার্পণ
Delegation of Authority

কর্তৃত্বাপনি বা কর্তৃত্ব হস্তান্তরের পূর্বে আমাদেরকে কর্তৃত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। কর্তৃত্ব কী? কর্তৃত্ব হলো এক ধরনের অধিকার কারণে উচ্চ স্তরের কর্মকর্তাগণ কার্য সম্পাদনের আদর্শ দান করেন।

সাংগঠনিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নানারকম কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। একটি সংগঠনে একাকী কেউ সব কাজ করতে পারে না। কাজেই একজন ব্যক্তির পক্ষে সংগঠনের সব রকম কার্য সম্পদান করা সম্ভবপর হয় না। তাকে সংগঠনের অন্য কাউকে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা বা কার্য সম্পাদনের অধিকার অর্পন করতে হয়। অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা তত্বাবধানের একটি সীমা আছে। তাই সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের সক্ষমতার ব্যবস্থাপককে কতিপয় কার্য ও তৎসম্পর্কিত কর্তৃত্ব তার অধঃস্তনদেরকে অর্পন কতে হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি; যদি কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধঃস্তন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন বিষয়ে কার্য সম্পাদনের অধিকার অর্পণ করেন তখন তাকে কর্তৃত্বার্পন কর্তৃত্ব হস্তান্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীর মধ্যে কার্য সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্বের সৃষ্টি করতে হবে।

কর্তৃত্বার্পনের নিয়মাবলী বা প্রক্রিয়া

How Authority is Delegated

কর্তৃত্বার্পন হতে হয় সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। তা না হলে সংগঠনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। কর্তৃত্বার্পণ নির্দিষ্ট হতে পারে, লিখিত বা অলিখিত হতে পারে, আবার কখনও বা সাধারণত হতে পারে। কর্তৃত্বার্পণ যদি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ না হয় তবে একজন ব্যবস্থাপক, তার কাছে কি ফলাফল চাওয়া হচ্ছে তা নাও বুঝে উঠতে পারেন। তাই যখন একজন ব্যবস্থাপককে লিখিতভাবে নির্দিষ্ট কাজের জন্য কর্তৃত্বের অধিকার বেধে দেওয়া হয় তখন তিনি সুষ্টুভাবে কাজটি করতে পারেন। এছাড়া যে সকল কার্য অধঃস্তনেরা সুষ্টুভাবে সম্পাদন করতে পারেন তাদেরকে সে সকল কার্যঅর্পন করা উচিত হবে না। এজন্য কর্তৃত্বার্পনের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে। চলুন এই নিয়মনীতিগুলো সম্পর্কে জানা যাক ঃ

১। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্ধারণ ঃ কর্তৃত্বাপনের পূর্বে একজন ব্যবস্থাপকের খেয়াল করা উচিত যে, কর্মচারীদের নিকট হতে তিনি কোন্ ধরনের ফলাফল বা কাজ আশা করেন এবং তাদেরকে তা অবহিত করা।

২। কার্য সুনির্দিষ্ট করণ ঃ যেহেতু কোন ব্যবস্থাপক সকল বিষয় একাকী সম্পাদন করতে পারে না সেহেতু তার কার্যাবলীর একাংশ তার অধঃস্তনদেরকে প্রদান করতে হবে। এ ধরনের কার্যবণ্টন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপককে নির্ধারণ করতে হবে যে, কোন্ কোন্ কার্য তিনি নিজস্ব আওতায় রাখবেন এবং কোন্ কোন্ কার্য অধঃস্তনদেরকে প্রদান করবেন।

৩। কর্তৃত্ব প্রদান ঃকার্য সুনির্দিষ্ট করার সাথে সাথে তা ঠিকমত সম্পাদনের জন্য অধঃস্তনদেরকে কর্তৃত্বার্পণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রাগ করতে হবে। অর্থাৎ কর্তৃত্বার্পনের সাথে সাথে তাকে কিছু দায়িত্ব দিতে হবে।

৪। দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ ঃকর্তৃত্বার্পণ করার সাথে সাথে অধঃস্তনকর্মীদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। কোন ব্যক্তিই তার মনমতো দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে কোন অধঃস্তন তার দায়িত্বের কিছু অংশ কখনও কখনও তার অধঃস্তনকে অর্পনক করলেও সে মূলত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে কার্যের জন্য দায়ি থাকবে। কার্য সম্পাদনের জন্য অধঃস্তনদের মনে সর্বদা একটি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্তৃত্ব গ্রহণকারীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভাগীকরণ, বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রকারভেদ কর্তৃত্বার্পণ বা ক্ষমতার্পন, কিভাবে ক্ষমতার্পন করা হয় একটি চিত্র অংকন করুন ও তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ:

বিভাগীকরণ হলো এমন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যাতে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যাবলীকে তাদের প্রকৃতির ভিত্তিতে কতিপয় আলাদা আলাদা এককে বিন্যাস করা হয়। এতে সমজাতীয় কাজগুলোকে এক একটি বিভাগের আওতাধীনে রাখা হয়। সংগঠনের সাফল্য অর্জনের জন্য বিশেষায়িত কাজগুলো সুচারু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংগঠনকে উপবিভাজনের মাধ্যমে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করাকে বিভাগীয়করণ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভাগীকরণের জন্য নানারকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদি কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধঃস্তন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেন তখন তাকে কর্তৃত্বার্পন বলে। কর্তৃত্বার্পন করতে হয় সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে। তা না হলে সংগঠনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। কর্তৃত্বার্পন নির্দিষ্ট হতে পারে, লিখিত বা অলিখিত হতে পারে, আবার কখনও বা সাধারণত হতে পারে। কর্তৃত্বার্পন যদি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ না হয় তবে একজন ব্যবস্থাপক, তার কাছে কি ফলাফল চাওয়া হচ্ছে তা নাও বুঝে উঠতে পারেন। তাই যখন একজন ব্যবস্থাপককে লিখিতভাবে নির্দিষ্ট কাজের জন্য কর্তৃত্বের ক্ষমতা বেধে দেওয়া হয় তখন তিনি সুষ্টুভাবে কাজটি করতে পারেন।

পাঠ-৭.৬ তত্ত্বাবধান পরিসর, কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর, কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় ও গ্রেকিউনাসের সূত্র

Span of Supervision, Optimum Span of Supervision Factors to be Considered in Determining Optimum Span of Supervision, Graicunas's Formula

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তত্ত্বাবধান পরিসর ও কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণে গ্রেকিউনাসের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তত্ত্বাবধান পরিসর

Span of Supervision

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, একজন নির্বাহী বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক তদারককৃত অধঃস্তনদের সংখ্যাই হলো তদারকী পরিসর বা তত্ত্বাবধান পরিসর। অন্যভাবে বলা যায়, একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে যে কয়জন কর্মী থাকে এবং যারা তার কাজের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে তার পরিসরকে তত্ত্বাবধান পরিসর বলে।

একজন ব্যবস্থাপক ঠিক কতজন কর্মীর কাজ দেখাশুনা করতে পারবে, তা সেই কাজের ধরণ, পরিস্থিতি এবং ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। সাধারণত একজন ব্যবস্থাপকের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীর চেয়ে বেশী কর্মীকে দক্ষতার সাথে এবং সমানভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না। যখন উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক তার অধীনে কর্মরত ব্যক্তিদের দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে তদারক করতে পারে তখন তাকে কার্যকর তত্ত্বাবধান বলে। কিন্তু একজন ব্যবস্থাপক যখন তার অধীনে কর্মরত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে না বা ভালভাবে দেখাশুনা করে না সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান কে অকার্যকর বলে।

কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর (Optimum Span of Supervision)

কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর বলতে একজন নির্বাহীর অধীনে সেই সংখ্যক অধস্তন বা কর্মী নিয়োজিত করা যাতে তিনি তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং তাদের নিকট থেকে সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কাজ আদায় করতে পারেন। নির্বাহীর সামর্থ্যের বাইরে কর্মী নিয়োগ করতে নির্বাহী কর্মভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে R. M. Hodgetts- এর একটি চিত্র উপস্থাপন করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, প্রতি কাম্য তত্ত্বাবধান পরীসর হলো সেই সংখ্যা যা নির্বাহীগণ সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারবে এবং অধস্তনরাও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদন করতে পারবে।

কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়

Factors to be Considered in Determining Optimum Span of Supervision

একটি প্রতিষ্ঠানের কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর করতে সেই পরিসরকে বুঝায় যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সর্বোচ্চ পরিমাণে অর্জন করা যায়। কত সংখ্যক কর্মীকে একজন ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বাধীন রাখা উচিত তা নানারকম সামাজিক অর্থনৈতিক, পরিবেশিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। পরিস্থিতি ভেদে কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসরের পরিবর্তন হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর একরকম হয় না। কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের জন্য যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হয় তা নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

১। কাজের প্রকৃতি ঃ কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রমিকের রুটিনবাধা কার্য তদারক করার জন্য নির্বাহীর অল্প সময় ব্যয় করা হয়। পক্ষান্তরে জটিল, গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগ আকর্ষণকারী কার্যের জন্য একজন নির্বাহীকে অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। অধিককন্তু অধঃস্তনদর নৈকট্য, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদীর প্রকৃতির উপরও কাম্য পরিধি নির্ভর করে।

২। তত্ত্বাবধানের জন্য প্রাপ্ত সময় ঃ ব্যবস্থাপকের হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকলে অধিক সংখ্যক শ্রমিক-কর্মীকে ভাল ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপক উপর্যুক্ত সময়ের অভাবে কর্মীদের কার্যে পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে পারে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত কারণে ব্যবস্থাপকের প্রাপ্ত সময়ের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

৩। ব্যবস্থাপকের দক্ষতা ঃ ব্যবস্থাপকের দক্ষতা বলতে তার নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত দক্ষতাকেই বুঝায়। এইরূপ দক্ষতা সকল ব্যবস্থাপকের একরূপ হয় না। সুতরাং ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এক একজন ব্যবস্থাপকের কাম্য তদারকী পরিসর এক একধরনের হয়ে থাকে।

৪। অধঃস্তনদের কর্মক্ষমতা ঃ শিক্ষিত, উন্নত, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের কার্যাবলী তদারক করা সহজ কারণ তারা সহজেই দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে পারে এবং এ কারণে তারা ভুলত্রুটিও কম করে। অল্প তত্ত্বাবধানেই তারা কার্যসম্পাদন করতে পারে, সুতরাং বলা যায়, যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা দক্ষ ও যোগ্য হয় সে প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপকদের কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসরও বড় হয়।

৫। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ধরণ ঃ আধুনিক সময়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপগণ সরাসরি যোগাযোগ ব্যতিরেকেই একত্রে অনেক অধঃস্তন কর্মীদের কাজ তদারক করতে পারে। তাই বলা যায় যে, বিভিন্ন রকম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও কৌশলের উপরে ভিত্তি করে তত্ত্বাবধান পরিসর হ্রাস বৃদ্ধি পেতে পারে।

৬। স্থায়ী পরিকল্পনার ব্যবহার ঃ প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা যদি স্থায়ী হয় তবে কর্মীগণ সহজেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকতে পারে এবং অল্প তত্ত্বাবধানেই কার্য সম্পাদন করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে স্থায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানের পরিসর বাড়ানো যায়। পক্ষান্তরে পরিকল্পনা অস্থায়ী হলে সেক্ষেত্রে অধঃস্তনদেরকে পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দিতেই ব্যবস্থাপকের অনেক সময় ব্যয় হয় ফলস্বরূপ তত্ত্বাবধান পরিসর ছোট হয়ে থাকে।

৭। বিকেন্দ্রীকরণ পরিমাণ ঃ কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের জন্য কার্যের বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করতে হয়। কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে ব্যবস্থাপক নানারকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের চাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। ফলে তত্ত্বাবধান পরিসর বাড়ানো যায়। পক্ষান্তরে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা অল্প হলে ব্যবস্থাপকও অধিকমাত্রায় ভারাক্রান্ত থাকে এবং অধিকসংখ্যক কর্মীর তদারকী করা সম্ভব হয় না।

৮। তত্ত্বাবধানের ব্যয় ঃ তত্ত্বাবধানের পরিধি বা পরিসর হ্রাসকরণের তত্ত্বাবধানের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় কিন্তু এতে ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী বা তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তত্ত্বাবধানের খরচ বৃদ্ধি পায়। তাই কাম্য তত্ত্বাবধান পরিধি নির্ধারণের জন্য তত্ত্বাবধানের ব্যয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে হয়।

ছোট বনাম বড় তদারকি পরিসর
Narrow Vs Wide Span of Supervison

তদারকি পরিসর কিরূপ হবে তার যেহেতু কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবতা ও প্রয়োজনের নিরিখেই তদারকি পরিসর নির্ধারণ করা হয়। তবে ছোট ও বড় উভয় প্রকার পরিসরেরই স্ব-স্ব সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। পরিসর ছোট হলে তত্ত্বাবধান স্তর বৃদ্ধি পাবে এবং পরিসর বড় হলে স্তর কমে যাবে। চিত্রসহ এদের উৎসের সুবিধা-অসুবিধা উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) ছোট তদারকি পরিসর সংবলিত সংগঠন (Organization with narrow span)

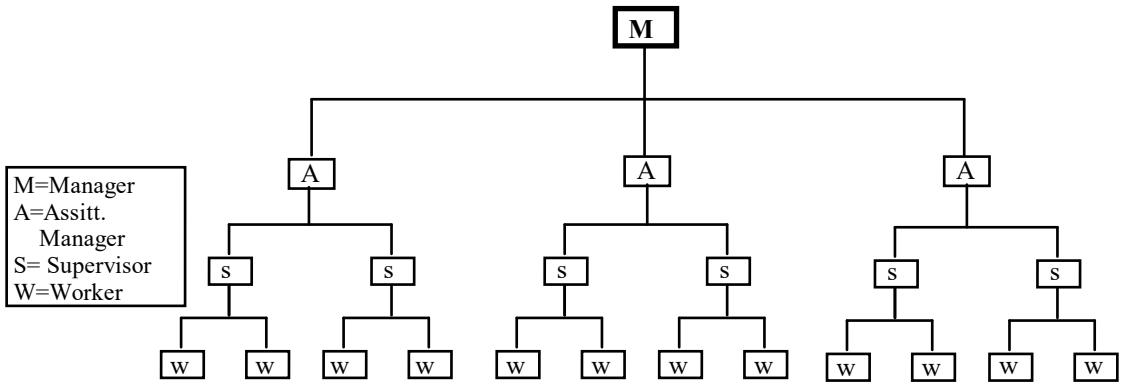

চিত্র ঃ (ক) ছোট তদারকি পরিসর সংবলিত সংগঠন।

সুবিধাসমূহ ঃ

১। নিশ্ছিদ্র তত্ত্বাবধান
২। নিশ্ছিদ্র নিয়ন্ত্রণ
৩। উন্নত উৎপাদিকা শক্তি
৪। উর্ধ্বতন-অধস্তনের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ
৫। অধস্তনদের প্রশিক্ষণ

অসুবিধাসমূহ ঃ

১। অধঃস্তনের কাজে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপ।
২। ব্যবস্থাপনার স্তর সংক্রান্ত বিপত্তি
৩। তত্ত্বাবধান ব্যয় বৃদ্ধি
৪। সর্বোচ্চ ও সর্বনিচ স্তরের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত দূরত্ব।

(খ) বড় তদারকি পরিসপর সংবলিত সংগঠন (Organization with wide span)

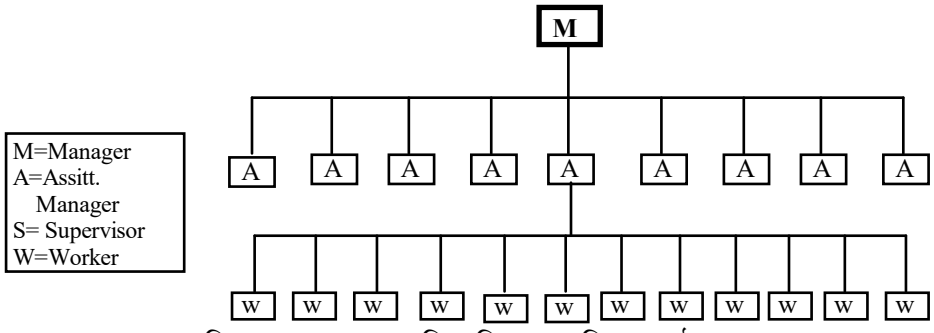

চিত্র ঃ (খ) বড় তদারকি পরিসর সংবলিত সংগঠন।

[সূত্র : এইচ.ওয়েরিচ ও এইচ.কুঞ্জ]

সুবিধাসমূহ ঃ

১। কর্তৃত্বার্পণের সুযোগ তৈরি
২। স্বচ্ছ নীতি অবলম্বন

৩। দক্ষ অধস্তন নিয়োগ
৪। ব্যয় হ্রাস
৫। সর্বোচ্চ স্তর ও সর্বনিচ স্তরের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব

অসুবিধাসমূহ ঃ
১। উর্ধ্বতনদের গুরুভারগ্রস্ততা
২। নিয়ন্ত্রণে ঢিলেমি
৩। প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ব্যবস্থাপকের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ কষ্টসাধ্য
৪। নিচ উৎপাদিকা শক্তি

তদারকি পরিসর ছোট না বড় হবে তা যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো ঃ

যে সকল কারণে তদারকি পরিসর ছোট হয়ে থাকে ঃ	যে সকল কারণে তদারকি পরিসর বড় হয়ে থাকে ঃ
১. প্রশিক্ষণের অনুপস্থিতি	১. অধস্তনদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ
২. অপ্রতুল বা অস্বচ্ছ কর্তৃত্বার্পণ	২. কর্তব্য সম্পাদনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ও স্বচ্ছ কর্তৃত্বার্পণ
৩. অ-পুনরাবৃত্ত কাজে অস্বচ্ছ পরিকল্পনা	৩. পুনরাবৃত্ত কাজে স্বচ্ছ পরিকল্পনা
৪.অযাচাইযোগ্য উদ্দেশ্য ও মাপকাঠি	৪. মাপকাঠি হিসেবে যাচাইযোগ্য উদ্দেশ্য ব্যবহার
৫.বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশে দ্রুত পরিবর্তন	৫. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশে ধীর পরিবর্তন
৬.দুর্বল ও অযথোচিত যোগাযোগ কৌশল এবং অস্পষ্ট নির্দেশ	৬. যথাযথ যোগাযোগ কৌশল ও সংগঠন কাঠামো প্রয়োগ
৭.উর্ধ্বতন-অধস্তনে অকার্যকর মিথষ্ক্রিয়া	৭. উর্ধ্বতন-অধস্তনে কার্যকর মিডিয়া
৮.অকার্যকর আলোচনা / সভা	৮. কার্যকর আলোচনা / সভা
৯.নিচ ও মধ্যম পর্যায়ে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ	৯. উচ্চ পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ (যে সকল উচ্চ স্তরীয় নির্বাহী বাহ্যিক পরিবেশ নিয়ে ব্যস্ত, তাদের জন্য)।
১০.অক্ষম ও অ-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যবস্থাপক	১০. সক্ষম ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক
১১.জটিল কাজ	১১. সহজ কাজ
১২.দায়িত্ব ও যৌক্তিক ঝুঁকি গ্রহণে অধস্তনদের অনিচ্ছা	১২. দায়িত্ব ও যৌক্তিক ঝুঁকি গ্রহণে অধস্তনদের ইচ্ছা
১৩.অপরিপক্ক / আনাড়ি অধঃস্তন	১৩. পরিপক্ক অধস্তন

গ্রেকিউনাসের সূত্র
Graicunas's Formula

এ সূত্রের উদ্ভাবক ফরাসী মনীষী ভি.এ. গ্রেকিউনাসের নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে। কাম্য তদারকি পরিসর সংক্রান্ত এ সূত্রে তিনি সংগঠন কাঠামোতে যে তিন ধরনের উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

১। প্রত্যক্ষ একক সম্পর্ক (Direct single relationship) ঃ প্রত্যেক অধস্তন কর্মীর সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার যে প্রত্যক্ষ একক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
২। প্রত্যক্ষ দলগত সম্পর্ক (Direct group relationship) ঃ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে অধস্তনদের দলগতভাবে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
৩। অধস্তনদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক (Cross relationship) ঃ বিভিন্ন স্তরের অধঃস্তনদের মধ্যে পারস্পরিক যে

সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রেকিউনাসের মতে কোন নির্বাহীর অধস্তনের সংখ্যা বা তদারকি পরিসর বৃদ্ধির সাথে অধঃস্তনদের একক সম্পর্ক আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যক্ষ দলগত সম্পর্ক ও অধঃস্তনদের মধ্যকার পাস্পরিক সম্পর্ক আরও অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ যে, এরূপ সম্পর্ক বৃদ্ধির কারণেই নির্বাহীদের পক্ষে একত্রে বহুসংখ্যক কর্মীর কাজ তদারক করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সুতরাং গ্রেকিউনাসের তত্ত্ব সঠিক তদারকি পরিসর নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রেকিউনাস তদারকি পরিসরের ক্ষেত্রে মোট সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যে গাণিতিক ফর্মূলা প্রদান করেছেন তা নিচরূপ ঃ

$N = N\left(\frac{2n}{2}+n-1\right)$ N = মোট সম্পর্কের সংখ্যা

n = অধঃস্তনদের সংখ্য

পূর্বোক্ত সূত্র অনুযায়ী একজন নির্বাহীর যদি ৫ জন অধঃস্তন কর্মী থাকে তা হলে মোট সম্পর্কের সংখ্যা (N) হবে-

$N = n\left(\frac{2n}{2}+n-1\right)$

$= 5\left(\frac{2^5}{2}+5-1\right)$

$=5\left(\frac{32}{2}+5-1\right)$

$= 5(16+5-1)$

$= 5(21-1)$

$= 5(20)$

$= 100$

গ্রেকিউনাসের উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী নির্বাহীদের তত্ত্বাবধান পরিধির উপর নির্ভরকারী মোট সম্পর্কের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	তত্বাবধান পরিসর , কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় ও গ্রেকিউনাসের সূত্রএকটি চিত্র অংকন করুন ও তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপঃ

একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে যে কয়জন কর্মী থাকে এবং যারা তার কাজের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে তার পরিসরকে তত্ত্বাবধান পরিসর বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর করতে সেই পরিসরকে বুঝায় যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সর্বোচ্চ পরিমাণে অর্জন করা যায়। কত সংখ্যক কর্মীকে একজন ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বাধীন রাখা উচিত তা নানারকম সামাজিক অর্থনৈতিক, পরিবেশিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। পরিস্থিতি ভেদে কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসরের পরিবর্তন হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর একরকম হয় না।

গ্রেকিউনাসের মতে কোন নির্বাহীর অধস্তনের সংখ্যা বা তদারকি পরিসর বৃদ্ধির সাথে অধঃস্তনদের একক সম্পর্ক আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যক্ষ দলগত সম্পর্ক ও অধঃস্তনদের মধ্যকার পাস্পরিক সম্পর্ক আরও অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ যে, এরূপ সম্পর্ক বৃদ্ধির কারণেই নির্বাহীদের পক্ষে একত্রে বহুসংখ্যক কর্মীর কাজ তদারক করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। সুতরাং গ্রেকিউনাসের তত্ত্ব সঠিক তদারকি পরিসর নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ-৭.৭ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কাকে বলে? কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ নির্ধারণের নীতি

What is Centralization and Decentralization? Determining Policies for Decentralization of Authority

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ নির্ধারণের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কাকে বলে?

What is Centralization and Decentralization?

বিকেন্দ্রীকরণ হলো ক্ষমতার্পণ প্রক্রিয়ার একটি অংগ। ক্ষমতার্পণ না করার অর্থ হলো, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ। সংগঠন মাত্রই কিছুটা ক্ষমতার্পণ থাকবেই। সংগঠনে সকল ক্ষমতা যেমন কেন্দ্রীভূত করে রাখা সম্ভব নয়- তেমনি সকল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করাও সম্ভবপর নয়। আসলে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া একটি অভিপ্রায়ের ব্যাপার। সংগঠন যত বড় হয়, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তত জটিল আকার ধারণ করে। ছোট সংগঠনে সিদ্ধান্ত সহজেই নেওয়া যায়।

সংগঠনে বেশীর ভাগ ক্ষমতা যখন ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সীমিত থাকে এবং উচ্চ পর্যায়েই বেশীর ভাগ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন তাকে কেন্দ্রীকরণ বলে। এর ঠিক বিপরীতটিই হলো বিকেন্দ্রীকরণ।

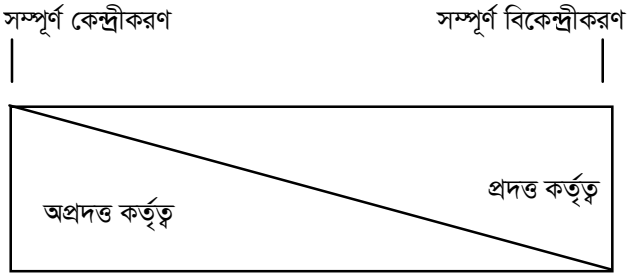

কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া

মোটকথা একটি সংগঠনে বিকেন্দ্রীকরণ বেশী করে হয়েছে এটা আমরা তখনই বুঝবো যখন ঐ সংগঠনে-

১. নিচের স্তরের ব্যবস্থাপকরা বেশীর ভাগ সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করেন।
২. নিচের স্তরের ব্যবস্থাপকরা যখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিজেরাই নিতে পারেন।
৩. নিচের দিকের সিদ্ধান্তগুলো যখন কাজকে বেশী রকম প্রভাবান্বিত করে।
৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণে যখন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কম আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালনা দর্শনেরও সংগঠিত করার একটি প্রতিবিম্ব হলো বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থাৎ সংগঠনের সমস্ত সিদ্ধান্ত উচ্চস্তরে নেওয়া হয়, নাকি নিচের স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করেন সেটা বোঝা যায় এবং সংগঠনের সবাইকে সংগঠিত করে কাজ করা সম্ভব হয় বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কোন কোন সিদ্ধান্তের কর্তৃত্ব নিম্নে দিকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর কোনগুলো উপরে রাখা হবে তা সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করতে হয়। কেননা, বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয়ে উপাচার্য সিদ্ধান্ত নেন না, কিছু কিছু সিদ্ধান্ত যেমন, অর্থবিষয়ক সিদ্ধান্ত অর্থ পরিচালক বা হিসাবরক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তারা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বলা যায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ নির্ধারণের নীতি

Determining Policies for Decentralization of Authority

ইচ্ছে করলেই যেমন কোন ব্যবস্থাপক সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করতে পারেন না, তেমনি সব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণও করতে পারেন না। সংগঠনে কতখানি বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব তা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আসুন এবার এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১। সিদ্ধান্তের উচ্চমূল্য ঃ বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবার আগে বিবেচনা করা হয় তা হলো সিদ্ধান্তের উচ্চমূল্য। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটির ফলাফল সংগঠনটিকে কতটুকু প্রভাবিত করবে- তার পরিমাপই হল সিদ্ধান্তটির মূল্য। যত মূল্যবান ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেহয়, তত উপরের দিকে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই সাধারণ নিয়মের আওতায় পরে। কখনও কখনও সিদ্ধান্তের মূল্য অর্থের মাপকাঠিতে মাপা হয়। আবার কখনও তা প্রতিষ্ঠানের সুনাম, কর্মীদের মনোবল অথবা সংগঠনের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের পরিমাপে মাপা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন শিল্পপতি নতুন কারখানা স্থাপনের জন্য জমি ক্রয় করবেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত উপরের স্তরেই নেওয়া হবে। কিন্তু কারখানা স্থাপনের পর ঐ কারখানায় দপ্তর চালানোর জন্য কাগজ, কলম ইত্যাদি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নীচু স্তরে নেয়া হবে।

২। নীতির ঐক্য ঃ কেউ কেউ সংগঠনে একই ধরনের নীতির পক্ষপাতি। সে কারণেই তাঁরা কেন্দ্রীকরণ নীতিতে বিশ্বাস করেন। সংগঠনে একই নীতি যদি সবার জন্য প্রযোজ্য হয় এবং একই সাধারণ সূচকের মাধ্যমে সব কিছু পরিমাপ করা হয়, তাহলে আন্তঃবিভাগীয় কাজ এবং ফলাফলের তুলনামূলক বিচার করা সহজ হয়। তবে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হলে নীতির ঐক্যের বদলে বিভিন্নতা প্রয়োজন। কারণ, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে একই নীতি প্রয়োজ্য নাও হতে পারে। তবে বিকেন্দ্রীকরণ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল নীতির যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩। সংগঠনের আকার ঃ সংগঠনের আকার বেশী বড় হলে অনেক বেশী সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন দেখা যায়। তাছাড়া এসব সিদ্ধান্ত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নিতে হয়। এই কারণে এগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা খুবই মুশকিল হয়ে পরে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বেশী সময় লাগে। সে কারণে বড় সংগঠনে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করাটা জরুরী হয়ে পরে। বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থান জুড়ে অবস্থিত সংগঠনে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা না থাকলে, তা অনেক সময় সংগঠনের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন, স্থানীয় পর্যায়ে কিছু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রয়োজন- এক্ষেত্রে হেড কোয়ার্টার যদি কর্মচারী নিয়োগ করে তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হবে। কিন্তু লোক নিয়োগ যদি স্থানীয় পর্যায়ে করা হয়, তবে সংগঠনের সময় ও অর্থ দুই-ই বাঁচবে।

এজন্য বড় সংগঠনের এই সমস্যা কাটানোর জন্য সংগঠনকে ছোট ছোট এককে ভাগ করা প্রযোজন। ফলে সংগঠনের কাজের নিপুণতা বেড়ে যায়। বিকেন্দ্রীকরণ সফল হতে হলে সংগঠনের সুনির্দিষ্ট আকার এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্বনির্ভরতা থাকতে হবে।

৪। সংগঠনের ইতিহাস ঃ বিকেন্দ্রীকরণ, সংগঠনের অতীত ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। কেননা, ব্যবস্থাপকরা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে কোন কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করবেন তার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। বিকেন্দ্রীকরণের অভিজ্ঞতা যদি তিক্ত হয়, তবে বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে মতামত গড়ে উঠবে। আর বিকেন্দ্রীকরণের ফল যদি ভাল হয়, তবে তার স্বপক্ষে জোড়ালো মতামত গড়ে উঠবে, যা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করবে।

৫। ব্যবস্থাপকের দর্শন ঃ মানুষের নিজস্ব বাস্তব দর্শন তাঁর, কার্যধারা ও অভিপ্রায়কে পরিচালনা করে থাকে। একইভাবে সংগঠনের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা দর্শন তাঁদের নীতিকে প্রভাবান্বিত করে। কাজেই বিকেন্দ্রীকরণ নীতিও ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর নির্ভরশীল। কখনও দেখা যায়, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একনায়কত্ব সুলভ মনোভাবের অধিকারী হন এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ সহ্য করেন না। আবার কখনও দেখা যায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উদার দর্শনে বিশ্বাস

করেন এবং সংগঠনের কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ মনোযোগী হন।

৬। স্বাধীনতার আকাঙ্খা ঃ স্বাধীনতার আকাঙ্খা কমবেশী সবার মধ্যেই বিরাজ করে। সংগঠনে ছোট খাট ইউনিটগুলোও চায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছুটা স্বাধীনতা। কেন্দ্রীয়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম ও নীতি অনেকেই অপছন্দ করেন। সুতরাং কর্মকর্তাদের মনোভাব বুঝে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

৭। যোগ্য ব্যবস্থাপকের অভাব ঃ যোগ্য ব্যবস্থাপকের অভাব অনেক সময় সংগঠনে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের বাধা হয়ে দাড়ায়। সংগঠনে যোগ্য ব্যবস্থাপকের অভাব না থাকলে বিকেন্দ্রীকরণ সহজ হয়। যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিম্নে দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেখানে যদি উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যবস্থাপক না থাকেন তাহলে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। একটি সফল বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। আবার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেও ব্যবস্থাপকরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ পেতে পারেন।

৮। বিকেন্দ্রীকৃত কার্যসম্পাদন ঃ কখনও কখনও প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা, যন্ত্রপাতি, প্রকৃতি, শ্রম বিভাজন, বিশেষায়ণ এবং কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। আবার কখনও সংগঠনের প্রকৃতি এমন যে কাজ সম্পাদন বিকেন্দ্রীকরণ না করে করার উপায় থাকে না, যেমন বাংলাদেশ বিমান সংস্থা। সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এর শৃংখল কর্মকাণ্ড। এখন, এই সংগঠনে যখন কাজ সম্পাদন বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে, তখন কর্তৃত্বও বিকেন্দ্রীকৃত হতে বাধ্য। কারণ প্রধান কার্যালয় থেকে এ ধরনের সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

৯। নিয়ন্ত্রণ কৌশলসমূহ ঃ সংগঠনে নিয়ন্ত্রণ কৌশলের অবস্থা কি রকম তার উপর বিকেন্দ্রীকরণ করার মাত্রা নির্ভরশীল। একজন ব্যবস্থাপক তখনই তার কর্তৃত্ব নিম্নে দিকে ছেড়ে দিতে রাজী হন যখন নিম্নে কর্মকর্তাদের কাজের পরিমাপ করার নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলো তার হাতে থাকে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। একজন ব্যবস্থাপক যদি তার নিম্নে কর্মকর্তাকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্তব্যয় করার কর্তৃত্ব দেন তবে, টাকাটা সঠিক ভাবে খরচ হল কি না তা নির্ধারণ করার নিয়ন্ত্রণ কৌশল তার কাছে থাকলে, তিনি ক্ষমতার্পণে কোন দ্বিধা না করেই কর্তৃত্বটি নিম্নে কর্মকর্তার হাতে তুলে দেবেন। সাধারণত ব্যবস্থাপনা তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি যদি নিখুঁত হয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ কৌশল যদি বর্তমান থাকে তাহলে, বিকেন্দ্রীরণ প্রক্রিয়া সহজ সাধ্য হয়।

১০। ব্যবসায়ে পরিবর্তন ঃ যদি কোন সংগঠনে ব্যবসায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে তবে তা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করে। যদি কোন ব্যবসা দ্রুত ভাবে বেড়ে উঠে তবে সে কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ছোট, বড় বা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। তখন সেই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করতে বাধ্য হন। যেমন, বেক্সিমকো গ্রুপ এর অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এই গ্রুপ নতুন নতুন ব্যবসায় হাত দিচ্ছে - এই গ্রুপের সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু বিকেন্দ্রীকরণ।

১১। পরিবেশের প্রভাব ঃ সংগঠনের বাইরের পরিবেশও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন, সরকারী নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় শ্রমিক সংগঠনসমূহ, কর নীতি ইত্যাদির কারণে সংগঠন তার নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের কারণে অনেক সময় সংগঠনের পক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, সরকার যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সংগঠনের পক্ষে মূল্য নির্ধারণ কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভবপর হয় না। জাতীয় পর্যায়ে গড়ে উঠা শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কারণেও অনেক সময় সংগঠনকে কেন্দ্রীভূত নীতি নির্ধারণে বাধ্য হতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কাকে বলে? কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ নির্ধারণের নীতি র একটি চিত্র অংকন করুন ও তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপঃ

বিকেন্দ্রীকরণ হলো ক্ষমতার্পণ প্রক্রিয়ার একটি অংগ। ক্ষমতার্পণ না করার অর্থ হলো, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ। সংগঠন মাত্রই কিছুটা ক্ষমতার্পণ থাকবেই। সংগঠনে সকল ক্ষমতা যেমন কেন্দ্রীভূত করে রাখা সম্ভব নয়- তেমনি সকল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করাও সম্ভবপর নয়। আসলে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া একটি অভিপ্রায়ের ব্যাপার। ইচ্ছে করলেই যেমন কোন ব্যবস্থাপক সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করতে পারেন না, তেমনি সব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণও করতে পারেন না। সংগঠনে কতখানি বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব তা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সংজ্ঞা দিন।
২. ব্যবস্থাপনা সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৩. ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নীতি বা আদর্শ বর্ণনা করুন।
৪. ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক সংগঠন কি কি ধরনের হতে পারে? সরল রৈখিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৫. সরল রৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. কার্যভিত্তিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৭. কমিটি সংগঠনের সংজ্ঞা দিন। কমিটি সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন। কমিটি সংগঠনের প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।
৮. বিভাগীকরণ কাকে বলে? বিভাগীকরণের পদ্ধতি বা প্রকারভেদ গুলো আলোচনা করুন।
৯. কর্তৃত্বার্পণ কাকে বলে? কিভাবে কর্তৃত্বার্পন করা হয় ?
১০. তত্ত্বাবধান পরিসর কাকে বলে? কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় আলোচনা করুন।
১১. তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণের গ্রেকিউনাসের সূত্র আলোচনা করুন।
১২. কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কাকে বলে?
১৩. কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ নির্ধারণের নীতি আলোচনা করুন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Ricky W. Griffin, Management,12th Edition, AITBS Publication, New Delhi.
- Introduction to Management, Dr.M A Mannan & Dr. Md. Ataur Rahman
- Fundamental of Management (10th Edition), Stephen P Robbins, Mary Coulter, David A DeCenzo, Harlow Publisher, England Pearson (2017).